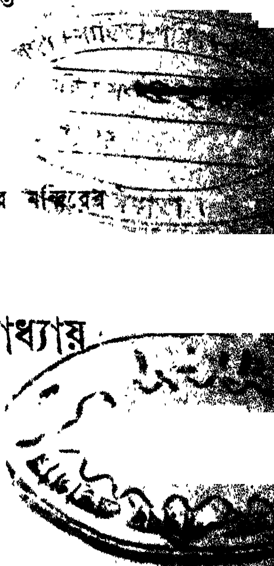
ব্রজ-বার্ত্তা ও তন্মাহাত্ম্য।

অর্থাৎ

শ্রীবৃন্দাবনধামের ব্রজচৌরাশীক্রোশের মধ্যে যে সমস্ত দর্শনোপযুক্ত মন্দির
আছে সেই সমস্ত মন্দিরের বিগ্রহাদিকে কিরূপভাবে ভেটাদি
(প্রণামী) দিয়া দর্শন করিতে হয় এবং ঐ সকল বিগ্রহাদি
কোন্ সালে কাহার দ্বারা স্থাপিত ও মন্দিরাদি কাহার
দ্বারা নির্ম্মিত এবং বন-প্রদক্ষিণ-কালীন যে সমস্ত
বন ও উপবন এবং বিগ্রহাদি দর্শন করিতে
হয়, তদ্বিষয় ও তন্মাহাত্ম্য অতি
বিস্তারিতভাবে সরল ভাষায়
এই পুস্তকে বর্ণিত
হইয়াছে।



শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীউর মন্দিরের

ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ—

শ্রীপার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায়

প্রণীত ও প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা

১৯৫।১ কর্ণওয়ালিস্‌ষ্ট্রীটস্থ শ্রীদেবকীনন্দন যন্ত্রালয়ে
শ্রীপুলিনবিহারী দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২২ সাল। মাহ কার্ত্তিক।

ভূমিকা।

কয়ক্রম মাসিক পত্রিকায় উক্ত হইয়াছে যে—কোন সঙ্কটাবহ ও দুরূহ কার্য্য উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ হিন্দুসন্তানগণ সর্ব্বপ্রথমেই আপন আপন অভীষ্ট দেবতাদির পূজা, প্রণাম, নামোচ্চারণ অথবা স্মরণ না করিয়া কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ বা কোন স্থানে পদক্ষেপ করেন না। অদ্য আমি যে সংকলিত ব্রজ-বার্ত্তার বিঘ্ননাশ হেতু সেই মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছি এরূপ নহে, যাঁহার কৃপায় আমরা শরীর ধারণে সমর্থ হইয়া নানা মঙ্গল ভোগ করিতেছি এবং যাঁহার অনুগ্রহে আজ আমি অপরিসীম আনন্দ সহকারে সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে এই মঙ্গলময় কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, শুভ কার্য্যের প্রারম্ভে কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে স্মরণ ও প্রণাম করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া মানুষ যাঁহাকে জানিতে না পারিয়া কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ খৃষ্টান কেহ বা বৌদ্ধ হইতেছেন, শুভ কর্ম্মের প্রারম্ভে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই সর্ব্বশক্তিমান পরম পিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া আজ ব্রজ-বার্ত্তার চতুর্থ সংস্করণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার নিকট প্রার্থনা তিনি যেন আমার মনোরথ পূর্ণ করেন।

অন্যান্য তীর্থ অপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবনের তীর্থ কার্য্যাদি অপেক্ষাকৃত ব্যয় বাহুল্য বলিয়া যাত্রীদিগের সুবিধার্থ এই পুস্তকে তীর্থকার্য্য সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় লিপি-বদ্ধ করিতে কোনরূপ ত্রুটী করা হয় নাই।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে পুস্তিকা রচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্যারীলাল ব্রজবাসী টেঁটীবালা মহাশয় সাহায্য করায় তাঁহার নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

সাবধান—সকলেই সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন যে—"সস্তার দুরাবস্থা চিরপ্রসিদ্ধ" অতএব যাত্রিগণ! অল্প মূল্যের পুস্তকাদি খরিদ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই নষ্ট করিবেন না—ইহাই অনুরোধ রহিল। লেখা বাহুল্য এই পুস্তকের কাটতি অত্যন্ত অধিক দেখিয়া আইনানুসারে রেজেষ্টারী করিয়া সকল স্বত্ব-রক্ষিত হইয়াছে। ইতি

শ্রীপার্ব্বতীচরণ শর্ম্মা।

প্রার্থনা।

গোলকবিহারী হরি মানস মোহন।
তুমি দুর্ব্বলের শক্তি,
ঘটে তব নামে মুক্তি,
স্বাধীন সর্ব্বজ্ঞ তুমি দেহ প্রাণ মন।
গোলকবিহারী হরি মানস মোহন॥

বৃন্দাবন প্রাণধন অকুলে কাণ্ডারী।
রাধিকা হৃদি-রঞ্জন,
তুমি রাখাল-জীবন,
দৈত্যকুল ধ্বংস কর বিনোদবিহারী।
বৃন্দাবন প্রাণধন অকুলে কাণ্ডারী॥

নন্দের নন্দন তুমি মুকুন্দ মুরারী।
দীনজনে অন্নদাতা,
তুমি কৃষ্ণ মোক্ষদাতা,
তুমি জীবনের সার ওহে বংশীধারী।
নন্দের নন্দন তুমি মুকুন্দ মুরারী॥

রীতি নাহি জানি হরি পূজিব কেমনে।
তুমি দেব আদি দেব,
ভজে তব মহাদেব,
পঞ্চমুখে তব নাম গায় পঞ্চাননে।
রীতি নাহি জানি হরি পূজিব কেমনে॥

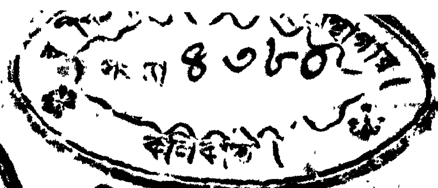
মতি যেন থাকে পদে ওহে ভগবান্।
এই ভিক্ষা যাচি পদে,
পাই যেন নিরাপদে,
কুমন্ত্রণা হৃদে যেন নাহি পায় স্থান।
মতি যেন থাকে পদে ওহে ভগবান্॥

শ্রী রা, জী, গো।

অশুদ্ধ সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পাতা	পঙ্‌ক্তি
বিরক্ত	কিন্তু বিরক্ত	৩	৪
কেনা	কোন	৩	৮
করণান্তর	করণানন্তর	৫	২২
করিম্না	করিয়া	১১	১১
কনাইয়ের	কানাইয়ের	১৭	২০
শ্রদ্ধাদি	শ্রাদ্ধাদি	২৩	১৫
গোচরণ	গোচারণ	৩১	৬
হইরা	হইয়া	ঐ	১৯
সজোতে	সজোরে	ঐ	২৭
হইভে	হইতে	৩৭	৪
ব্রজনাভের	বজ্রনাভের	ঐ	১১
ম্নান	স্নান	ঐ	১৫
আপান আপন	আপন আপন	৪৫	১০
তদনুয়ায়ী	তদনুযায়ী	৪৮	৩
বারিধার ন্যায়	বারিধারার ন্যায়	ঐ	১৮





ব্রজ-চৌরাশী ক্রোশ পরিভ্রমণ সমন্বিত

ব্রজ-বার্ত্তা ও তন্মাহাত্ম্য।

"জ্ঞান কর্ম্মে যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেমরস॥"

ভগবদ্ভক্ত যাত্রিগণ!

লেখা বাহুল্য,—যে ধামের নাম একবার স্মরণ মাত্রেই মানবগণের বহু জন্মের পাপরাশি এককালে দূরীভূত হয়, সেই পরম পবিত্র শ্রীধামবৃন্দাবনের তীর্থ-কার্য্য-প্রণালী ও ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত যাবদীয় দর্শনোপযুক্ত তীর্থ এবং লীলাস্থলী ও তন্মাহাত্ম্য বিশদরূপে বর্ণন করা আমার ন্যায় লঘুবিদ্য ও অদূরদর্শী লোকের সাধ্যাতীত; তবে বিবিধ ধর্ম্ম গ্রন্থাবলম্বনে যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম। যাহাতে পাঠক ও পাঠিকাগণের সহজে বোধগম্য হয়, সেই-রূপ সরল ভাষায় এই গ্রন্থখানি লিখিত হইল। বর্ণাশুদ্ধি অথবা মুদ্রাপ্রমাদজনিত কোনরূপ ভ্রম দৃষ্ট হইলে পাঠক পাঠিকা কৃপা পূর্ব্বক স্বীয় ঔদার্য্যগুণে ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—"ন রামশব্দোচ্চারণেন নরস্য মুক্তির্যথা বারি বারি কথয়তো ন যাতু তৃষ্ণা। হৃদয়োত্থিতপ্রেম্না যদ্রূপ ভক্তিমাবিশতি তথৈব নাম ফলমস্তি" অর্থাৎ "রাম" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই যে কেবল মানবের মুক্তি হয় তাহা নহে, যেমন "জল জল" এই শব্দ উচ্চারণেই পিপাসার শান্তি হয় না। সুতরাং হৃদয়োত্থিত প্রেম দ্বারা যে প্রকার ভক্তির আবেশ হইবে, নামফলও সেই-রূপেই লাভ হইবে। ফলতঃ যে প্রকার পাপী হউক না কেন, সে ব্যক্তি যদি পাপভয়ে ভীত হইয়া আন্তরিক প্রীতির সহিত ভগবানে আত্মনির্ভর পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইতে পারে, তাহা হইলে ভক্তাধীন শ্রীভগবান্ যে নিজ কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তাহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অন্তিমে তাহাকে ব্রহ্মাদি-দেববাঞ্ছিত ও সর্ব্বসুখপ্রদ স্বীয় পবিত্র পাদমূলে স্থান দান করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণেতিহাসই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব যাত্রিগণ! যাঁহার উদ্দেশে বহু অর্থ ব্যয় ও অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া এই পবিত্র তীর্থে আগমন করিবেন, সেই অধমতারণ দীনবন্ধু শ্রীহরির শ্রীচরণযুগল সতত অন্তরে স্মরণপূর্ব্বক অন্যের বিনানুরোধে ভক্তিভাবে ও সরলচিত্তে আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী তীর্থকার্য্যাদি সমাধা করিয়া স্বীয় অর্থব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

নবাগত যাত্রিগণ বৃন্দাবন ষ্টেশনের বাহিরে পদার্পণ করিবামাত্রই ব্রজবাসিগণ প্রত্যেক যাত্রিকে তাঁহাদিগের কি নাম, কোথায় নিবাস, পিতার নাম কি, পূর্ব্বে কোন আত্মীয়-

কুটম্ব আসিয়াছিলেন কিনা এবং কোন্ কুঞ্জে থাকা হইবে ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রশ্ন উপর্য্যুপরি জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। অবশ্য স্বীকার করি ইহাতে পথক্লান্ত যাত্রিগণ বিরক্ত হইতে পারেন, বিরক্ত না হইয়া হৃষ্টচিত্তে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবেন; কারণ, ব্রজবাসিদিগের ইহাই একমাত্র উপজীবিকা বলিয়া যাহাতে যজমানগণ ভ্রমবশতঃ অন্য স্থানে না যাইতে পারেন তজ্জন্যই যাত্রিদিগকে এরূপভাবে পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করা হয়। যখন পাণ্ডা ভিন্ন কেনা তীর্থকার্য্য সম্পন্ন হয় না, তখন যাত্রিগণ ব্রজবাসী সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে বিশেষ যত্নবান হইবেন এবং তৎপশ্চাৎ বাসোপযোগী কুঞ্জ মনোনীত করিয়া পুস্তকের লিখিতমত তীর্থ-ক্রিয়া ও দর্শনাদি করিবেন।

অনেক ভগবদ্গত-প্রাণ যাত্রা ষ্টেশন হইতে বাসায় যাইবার পূর্ব্বে (যাঁহার জন্য মন-প্রাণ কাঁদিতেছে) সেই ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীকে দর্শন করিয়া পরে বাসায় গমন করেন। এরূপ দর্শন করাকে "ধূলাপায়ে দর্শন" বলে। ধূলাপায়ে দর্শন করিবার সময় যৎকিঞ্চিত প্রণামী দিতে হয় এবং ঐ সকল যাত্রিরা ভেট্ দিবার সময় প্রায়ই প্রথম শ্রেণীর ভেট্ পাঁচ টাকা কিম্বা তিন টাকা দিয়া থাকেন। শাস্ত্রে কথিত আছে, শ্রীধামবৃন্দাবন (কৃষ্ণদেহ রূপ) পঞ্চ যোজন বিস্তৃত, কিন্তু সচরাচর লোকে ষোল ক্রোশ ব্যবধান বলিয়া থাকেন। এক যোজন—সাত মাইল বা সাড়ে তিন ক্রোশের সমান। এই পরম পবিত্র অপূর্ব্ব-ধাম—সুনির্ম্মল ও পবিত্র-স্নিগ্ধ-সলিলা শ্রীযমুনার দ্বারা মেখলার

ন্যায় পরিবেষ্টিত, নানাবিধ মনোহর ফলপুষ্প-পরিপূর্ণ তরুলতা কর্ত্তৃক বিরাজিত এবং গোপবালকগণের শৃঙ্গবেণুর মধুর রবে শব্দময়ী। ময়ূর, কোকিল, খঞ্জন, ভ্রমর, শুক-শারী ও কপোতাদি বিহগকুলকণ্ঠ-নিনাদে জাগ্রত এবং বহুবিধ বাপী, কুণ্ড,তড়াগ ও সরোবর সুশোভিত,অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া-বৃন্দাসেবিত দেব-মনোহর বনমালায় বিভূষিত। এতদ্ব্যতীত অনুপম-রূপ-লাবণ্যময়ী ও বিশালায়তলোচনা ব্রজসুন্দরী-গণকে দর্শন করিলেই শ্রীভগবানের পূর্ব্ব লীলাকাহিনী স্মৃতি-পথে উদিত হইয়া হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে এবং সেই লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলাশক্তি অন্তরে চিন্তা করিতে করিতে ক্ষণকালের জন্য আত্ম ও জগৎ বিস্মৃত হইয়া ভগবল্লীলারসে দেহ মন নিমজ্জিত হইয়া যায়।

শ্রীভগবান আত্মারূপে শ্রীবৃন্দাবনধামে বিরাজমান থাকিয়া নিত্য-লীলা সম্পাদন করেন বলিয়া সাধু-বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে,—

"বৃন্দার সেবিত বন, নাম তার বৃন্দাবন,
ত্রিলোক বাঞ্ছিত মুখ্যধাম।"

অতএব এই অচিন্ত ও সুখময় স্থানে আসিয়া যদ্যপি কোন ভাগ্যবান পুরুষ একবারমাত্র শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-দেবজীর কোটী-কন্দর্পসম ভুবনমোহন রূপমাধুরী-সন্দর্শন করেন তাহাহইলে তাঁহাকে যমপুরী দর্শন করিতে হয় না। অথচ গর্ভবাস-রূপ নরক যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করেন।

শ্রীবৃন্দাবনধামের মধ্যে গোবিন্দবাজার বা লুইবাজার

সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই বাজারে শাক্‌শব্জী, সূতি ও উণ বস্ত্রাদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট অথচ সুবিধামত পাওয়া যায়। ইহার সন্নিকটেই রেতিয়াবাজার। এখানে লুচি, কচুরী, মিঠাই এবং বিবিধ প্রকার বস্ত্রাদি বিক্রয় হয়। বৃন্দাবনের লোক-সংখ্যা প্রায় ছাব্বিশ হাজার হইবে এবং পাঁচ হাজারের অধিক ঠাকুর-বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীরাধারমণ এবং শ্রীগোকুলানন্দজী এই সাতটী মন্দিরই দেবালয় মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। যদ্যপি কোন যাত্রী উল্লিখিত মন্দিরের মধ্যে কোন মন্দিরের প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্ব দিবসে নয় আনা পয়সা মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিলে, পরদিবস মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইতে পারেন এবং যাঁহারা স্বীয় বাসায় প্রসাদ লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে মন্দিরস্থ প্রসাদবাহী ব্রাহ্মণ ও সঙ্গের সিপাহীকে দূরতা অনুসারে অতিরিক্ত দুই আনা হইতে চারি আনা দিতে হয়।

যাহা হউক যাত্রিগণ! শ্রীধামবৃন্দাবনে পৌঁছিয়া প্রথমে ব্রজবাসী মহাশয়ের সহিত সর্ব্বপাপ-বিনাশিনী শ্রীযমুনা-তীরে যাইয়া সংকল্পান্তে স্নান করিবেন। সংকল্প করিবার পূর্ব্বে "ওঁ অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতং। সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপং ত্বাং পশ্যামি নিজচক্ষুষা" এইরূপ স্তুতি পাঠ করণান্তর একটী টাকা ও একটী নারিকেল ব্রজবাসী পাণ্ডাজীর হস্তে দিয়া দণ্ডবৎ পূর্ব্বক পবিত্র সলিলে নামিয়া স্নান করিবেন। বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীযমুনানীরে অবগাহনপূর্ব্বক

স্নান কিম্বা জলপান করিলে মানবগণের সপ্ত পুরুষ পবিত্র হইয়া থাকে। তদনন্তর শ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর যুগল-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাপিত প্রাণকে শীতল করিবেন। কর্ণাট-দেশস্থ শ্রীকুমারদেবের পুত্র শ্রীরূপগোস্বামী মহাশয় দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজী স্থাপিত হইয়াছেন। শ্রীকুমারদেবের অনেক সন্তান সন্ততি হয়, তন্মধ্যে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীবল্লভ এই তিন জনই পরম ভক্ত ও পরম বৈষ্ণব-পরায়ণ ছিলেন। উক্ত শ্রীরূপগোস্বামী মহাশয় মহাপ্রভুর কৃপায় নিজ কর্ম্মস্থল গৌড় (মালদহ) হইতে যখন ভগবদ্দর্শনেচ্ছায় মহা-ব্যাকুল হইয়া শ্রীধামবৃন্দাবনে আসিয়াও বাঞ্ছিত শ্রীভগবানকে দেখিতে পাইলেন না, তখন "হা গোবিন্দ! হা গোবিন্দ! হা প্রাণনাথ! তুমি কোথায়?" ইত্যাদি প্রেমোচ্ছ্বাস শব্দ উচ্চারণ করতঃ রোদন করিতে করিতে গ্রামে গ্রামে বনে বনে এমন কি ব্রজবাসিদিগের ঘরে ঘরে শ্রীভগবানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর এক দিবস অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব জ্যোতিসম্পন্ন ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্রীরূপগোস্বামীকে কহিলেন যে ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটবর্ত্তি "গৌমাটিলা" নামক স্থানে একটী প্রধানা গাভী প্রত্যহ আসিয়া যে স্থানে দাঁড়াইয়া দুগ্ধ দান করে সেই পবিত্র স্থানে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা পরমাত্মা "শ্রীগোবিন্দদেব" আছেন। এই বলিয়া সেই ব্রজবাসী ব্রাহ্মণরূপধারী ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হইলে পশ্চাৎ শ্রীরূপগোস্বামী মহাশয় উক্ত নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে শ্রীগোবিন্দ-দেবজীকে প্রাপ্ত হইয়া মহা আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর পুরাতন মন্দিরের উত্তর দিকে

অদ্যাবধি "যোগপীঠ স্থান" বর্ত্তমান আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কালপ্রভাবে ঐ পীঠস্থান এক্ষণে পাকশালায় পরিণত হওয়ায় দক্ষিণ দিকে যে অপর একটী পীঠস্থান আছে, ব্রজবাসিগণ তাহাই যাত্রিগণকে দর্শন করাইয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে উহা শ্রীগোবিন্দজীর পীঠস্থান নহে তবে যেরূপ প্রবাদ আছে তাহাতে বোধ হয় উহা "শ্রীবৃন্দাদেবীর" পীঠস্থান হইতে পারে। আকবর বাদশাহের সময়ে জয়পুরাধিপতি ভগবানদাসের পুত্র মহাত্মা মানসিংহ ১৫৭৮ সালে শ্রীগোবিন্দ-দেবজীর পীঠস্থান এবং ১৫৯১ সালে অলৌকিক কারুকার্য্য সম্পন্ন অত্যুচ্চ বৃহদায়তন প্রস্তর খচিত শ্রীগোবিন্দদেবজীর পুরাতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে মহামান্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কেবল প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ হেতু উক্ত মন্দির অনুমান ১৮৭৫ সাল হইতে নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া অদ্যাবধি ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। শ্রীরাধা-গোবিন্দজীর সেবাধিকারী মহাত্মা শ্যামসুন্দর গোস্বামিজীর সময়ে সন ১৮৭৩ সালে যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট জয়পুর মহা-রাজার অনুমতিক্রমে পুরাতন মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য প্রথম আরম্ভ করেন তখন উক্ত মহারাজা গবর্ণমেণ্টের হিসাব অনু-যায়ী এককালীন পাঁচ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত বহড়ুর জমিদার ৺নন্দকুমার বসু মহাশয় ১৮১৯সালে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, অদ্যাপি তাঁহার অতুল যশঃ জগৎ ব্যাপিয়া ঘোষিত হইতেছে। গোপীনাথের বাজারের শেষ সীমায় সদর রাস্তার উপরে "হারাবাড়ী" নামক

কুঞ্জে শ্রীরাধাগোবিন্দজীর যে সেবা প্রকট আছে তাহা উক্ত জমিদার মহাশয়ের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ঠাকুরের পুরাতন প্রতিমূর্ত্তি সন ১৩১৮ সালের ২৬শে চৈত্র তারিখে খণ্ডিত হওয়ায় পুনরায় ১৩১৯ সালের বৈশাখ মাহায় নূতন একটী শ্রীগোবিন্দঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

হরিভক্তি বিলাসে উক্ত আছে যে,—"রিক্তপাণির্ন পশ্যেত রাজানং ভিষজং গুরুং। নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ"॥ অর্থাৎ রিক্ত হস্তে গুরু ও দেবতাদি দর্শন শাস্ত্র নিষিদ্ধ। অতএব যাত্রিগণ! গোস্বামিদিগের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদি দর্শন করিবার পূর্ব্বে ঠাকুর বাড়ীর কাছারিতে "ভেট্ বা প্রণামী" দিবেন। সচরাচর ভগবদ্ভক্ত যাত্রিগণ যেরূপ ভেট্ করিয়া থাকেন তাহাই নিম্নে লিখিত হইল। যথা,—প্রথমশ্রেণীর ভেট্ পাঁচ টাকা অভাবপক্ষে তিন টাকা। যাঁহারা পাঁচ টাকা ভেট্ করেন তাঁহাদিগকে ছড়িদারী ও ফৌজদারী বাবদ ছয় আনা এবং তিন টাকা স্থলে চারি আনা দিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভেট্ আড়াই টাকা, অভাবপক্ষে দুই টাকা এবং ছড়িদারী ও ফৌজদারী বাবদ তিন আনা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভেট্ পাঁচ সিকা হইতে এক টাকা এবং ছড়িদারী ও ফৌজদারী বাবদ এগার পয়সা করিয়া দিতে হয়। এতদ্ব্যতীত যে সকল যাত্রী পদব্রজে বৃন্দাবনধামে আইসেন তাঁহারা আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী আট আনা হইতে দুইআনা পর্য্যন্ত ভেট্ করিয়া থাকেন। আট আনা ভেট্ করিলে ছাড়দারী ও ফৌজদারী বাবদ সাত পয়সা, চারি আনায় পাঁচ পয়সা

এবং দুই আনার ভেটে তিন পয়সা করিয়া দিতে হয়। যাহা-হউক যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর ভেট্ করেন তাঁহাদিগের মস্তকের উপর একখানি জরীর পাড় বসান রঙ্গিন প্রসাদী বস্ত্র দেওয়া হয়, ইহাকে "একলাই শিরপা" কহে, দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রি-দিগকে একখানি লালবস্ত্র দেওয়া হয়,সচরাচর লোকে ইহাকেই "লালযাত্রী" বলিয়া থাকেন, এবং তৃতীয় শ্রেণার যাত্রিদিগকে কোন প্রসাদী বস্ত্র দেওয়া হয় না, কেবল তাঁহাদিগের নাম 'ভেট খাতায়' লিখিয়া লওয়া হয় মাত্র। অপরপক্ষে যাঁহারা পদব্রজে আসিয়া আট আনা, চারি আনা এবং দুই আনা ভেট্ দেন তাঁহাদিগের নাম ভেট খাতায় লেখা হয় না, তবে সকল শ্রেণীর যাত্রিগণ ভেটান্তে লাড়ু প্রসাদ পাইয়া থাকেন।

গোস্বামিকুলোদ্ভব যাত্রী মহাশয়দিগের ভেট্ কাছারির সম্মুখে না হইয়া ঠাকুরের সম্মুখেই হইয়া থাকে এবং ইহাকে "চৌকাঠ ভেট্" কহে। এই চৌকাঠ ভেট এক টাকার কম দেওয়া উচিত নহে, কারণ ইঁহাদিগের সম্মান রক্ষার্থ একখানি করিয়া "একলাই শিরপা" দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর মন্দিরে যখন যাত্রিগণ ভেট্ করিতে যান তখন মন্দিরের কামদার অথবা ফৌজদার যাহাতে ভেটের পরিমাণ অধিক হয়, তজ্জন্য যাত্রিদিগের সহিত নানারূপ তর্ক বিতর্ক করেন বলিয়া অধিকাংশ ভদ্র সমাজ-ভুক্ত যাত্রিগণ সরল প্রাণে আঘাত পাইয়া থাকেন, কিন্তু এবম্বিধ বাধাজনক কার্য্যে যাত্রিগণ কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া পূর্ব্বলিখিত প্রথানুযায়ী ভেট্ পূজা দিয়া শ্রীরাধা-গোবিন্দদেবজীর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ-

জীকে দর্শন করিয়া বাহির দরজার পূর্ব্বদিকে যে "দাউজীর" মূর্ত্তি আছেন তাঁহাকে এক পয়সা করিয়া প্রত্যেক যাত্রীর (মঙ্গলার্থ) ভেট্ দেওয়া কর্ত্তব্য। ফাল্গুন মাসের একাদশী তিথিতে শ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর "হোলী" বা দোলযাত্রা হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর দর্শনান্তে যাত্রিগণ (যাঁহার সৌন্দর্য্যে কুব্জা সুন্দরী মোহিত হইয়াছেন) সেই শ্রীশ্রীমদনমোহনদেবকে দর্শন করিতে যাইবেন। মহাত্মা শ্রীসনাতন গোস্বামীর দ্বারা শ্রীমদনমোহনজী স্থাপিত হইয়াছেন। উপরের লিখিতমত ভেট্, ছড়িদারী এবং ফৌজদারী এখানেও সমভাবে করিতে হয়। কোন বিষয়ে কোনরূপ পার্থক্য নাই। অনুমান ৮০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথমে ভেটাদি কার্য্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে না হইয়া এই মন্দিরেই সম্পন্ন হইত। মন্দিরের পশ্চাদ্দিকে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি স্থান আছে এবং প্রত্যেক বৎসর আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উৎসব হইয়া থাকে!

প্রবাদ আছে ১৫৩৪ সালের মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাশয় মথুরাধামে কোন চৌবের বাটী হইতে শ্রীমদনমোহনদেবকে প্রাপ্ত হন এবং তৎপরে বৃন্দাবনধামে যমুনা তটোপরি দুঃশাসন-টীলার উপরে একটী পর্ণকুটির নির্ম্মাণ করতঃ যথারীতি শ্রীমদনমোহন-দেবের পূজা করিতে থাকেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাশয় যখন বৃন্দাবনধামে শুভাগমন করেন তখন বৃন্দাবন প্রকৃতই বন ছিল সুতরাং গোস্বামী মহাশয় গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা বৃত্তি

দ্বারা যে ময়দা পাইতেন তাহাই কোন রকমে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া শ্রীমদনমোহনজীর ভোগ লাগাইতেন; কিন্তু যিনি প্রত্যহ মাখন, মিসরী ও দধি দুগ্ধাদি উত্তম উত্তম খাদ্য দ্রব্য সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহার এ নীরস সেবা মনঃপূত হইবে কেন? এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে এক দিবস শ্রীসনাতনগোস্বামী স্বপ্নে আদেশ পাইলেন যে "হে সনাতন! তুমি প্রত্যহ মোটা রুটি অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া যে আমার ভোগ দাও তাহাতে লবণের অংশ না থাকায় আহার্য্য দ্রব্যের কিছু মাত্র আস্বাদ পাই না, অতএব আজ হইতে ঐ রুটিতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া ভোগ প্রস্তুত করিও তাহা হইলে আমি ভোজন করিরা বেশ তৃপ্তি লাভ করিব।" ইহার উত্তরে শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাশয় নিবেদন করিলেন,যে প্রভু! আজ আপনি আমার নিকট লবণ চাহিলেন, কাল বলিবেন বস্ত্র অলঙ্কারাদি দাও, পরশ্ব আরও কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তু চাহিতে পারেন? কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্যাদি আমি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করিব? যদ্যপি আপনার এরূপ "রাজ-সেবার" ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনি স্বয়ং তাহার বন্দোবস্ত করিয়া লউন, এসকল কার্য্য আমার সাধ্যাতীত জানিবেন।

উক্ত ঘটনার কয়েক দিবস পরে মুলতান নিবাসী ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ রামদাস নামক জনৈক সওদাগর বহু মূল্য পণ্য দ্রব্যাদি লইয়া নৌকারোহণে দিল্লী হইতে আগরা সহরে আসিবার সময় অকস্মাৎ তাহার নৌকা উল্লিখিত দুঃশাসন-টীলার যে চড়া ছিল তাহাতে আট্‌কাইয়া যায়। বণিক তিন দিবস তিন রাত্রি

শত চেষ্টাতেও নৌকাখানি চড়া হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া অবশেষে শ্রীসনাতনগোস্বামীর নিকট সমস্ত ঘটনা বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাশয় আশ্বস্ত বাক্যে বণিককে এই আজ্ঞা দেন যে, এ সকল কথা আমাকে না বলিয়া ঐ পর্ণকুটির মধ্যে আমার অভীষ্ট দেবতা "শ্রীমদন-মোহন ঠাকুর" আছেন, তাঁহার নিকটে সবিশেষ জানাইলে তিনি তোমার অভিলাষ তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিবেন। তদনুসারে বণিক শ্রীমদনমোহনজীর নিকট আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া শ্রীযমুনাজীর তীরে ফিরিয়া আসিয়া যখন দেখিলেন যে শ্রীভগবানের কৃপায় নৌকাখানি ধীরে ধীরে চড়ামুক্ত হইয়া অগাধ জলে ভাসিতেছে তখন বণিক প্রফুল্লচিত্তে আগরা সহরে চলিয়া যান এবং তথায় অল্পকালের মধ্যে সমস্ত পণ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া উপকারীর প্রত্যুপকার করা উচিত বিবেচনায় পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীসনাতন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বণিক কিঞ্চিৎ অর্থ শ্রীমদনমোহনজীর ভেট্ স্বরূপ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী মহাশয় নগদ ভেট্ গ্রহণে অসম্মত হইয়া বণিককে এই উপদেশ দেন যে, নগদ ভেটের পরিবর্ত্তে শ্রীমদনমোহনজীর একটী মন্দির এবং টীলার নীচে "প্রস্কন্দন" নামক যে কাঁচাঘাট আছে ঐ ঘাটটী পাকা করিয়া দাও এবং অন্যপক্ষে যাহাতে শ্রীমদনমোহনজীর উত্তমরূপ রাজ-সেবা চলে তাহারও একটী ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অর্থোপার্জ্জনের সার্থকতা সম্পাদন কর। ধনশালী বণিক এই সৎ উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় আদেশ প্রচার দ্বারা সমস্ত কার্য্য অতি

ত্বরায় সম্পন্ন করিয়া বিপুল যশ লাভ করেন। শ্রীমদনমোহনজীর পুরাতন মন্দির অনুমান ১৬২৮ সালে তৈয়ার হয় এবং নূতন মন্দির ১৮২৩ সালে উক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। নবাব আরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে মহারাজা জয়পুরাধিপতি অন্যান্য দেবদেবীর ন্যায় শ্রীমদনমোহনজীকেও স্বরাজ্যে লইয়া যান। কিন্তু উহাঁর শ্যালক করৌলীর রাজা স্বর্গীয় গোপাল সিংহজীর অনুরোধে শ্রীমদনমোহনজীকে তাঁহারই হস্তে সমর্পন করেন এবং ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে করৌলীর রাজ্যে মন্দির নির্ম্মিত হয়। শ্রীমদনমোহনজীর "হোলী" বা দোলযাত্রা ফাল্গুন মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে হইয়া থাকে।

যাত্রিগণ শ্রীশ্রীমদনমোহনজীর দর্শনান্তে শ্রীগোপীনাথজী দর্শন করিতে যাইবেন। শ্রীমধুপণ্ডিত মহাশয়ের দ্বারা শ্রীগোপীনাথজী স্থাপিত হইয়াছেন। উল্লিখিত দুই মন্দিরের ন্যায় এখানেও সমভাবে ভেটাদির কার্য্য করিতে হয়। স্বনামখ্যাত উক্ত নন্দকুমার বসু মহাশয় ১৮২১ সালে এখানকার নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং পুরাতন মন্দির রাজপুতানার অন্তর্গত শেখাবতী নিবাসী ধার্ম্মিক প্রবর কছওয়াহ ঠাকুর বংশীয় রায়শীলজীর দ্বারা আন্দাজ ১৫৮৯ সালে নির্ম্মিত হয়।

মহাজন বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে "গোপীনাথের বাম ভাগে

"বসুধা জাহ্নবা দুই ঠাকুরাণী।
যাঁর পুত্র বীরভদ্র জগতে বাখানী"॥

সুতরাং এ মন্দিরে ঠাকুর দর্শনের একটু তারতম্য আছে, কারণ অন্যান্য মন্দিরে কেবল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপই দর্শন হইয়া

থাকে, কিন্তু যাত্রিগণ! এ মন্দিরে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ দিকে শ্রীমতী রাধারাণী এবং বামপার্শ্বে শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণী বিরাজমানা আছেন। ইহার গূঢ় রহস্য অনেকে জানেন না বলিয়া সংক্ষেপে জানাইতেছি যে, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী জাহ্নবাজী গোবর্দ্ধনতীর্থ হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া যখন শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন এবং শ্রীগোপীনাথজীকে দর্শন করেন তখন ঠাকুরের বাম পার্শ্বে প্রিয়াজী অর্থাৎ রাধারাণীর মূর্ত্তি না থাকায় অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীমধু পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ঐ সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া গৌড়দেশে চলিয়া যান এবং বনবিষ্ণুপুরের বীরহাম্বির রাজার নিকটে সবিশেষ বিবরণ জ্ঞাত করাইয়া তিনটি "রাধার" মূর্ত্তি প্রার্থনা করেন। স্বধর্ম্ম পরায়ণ হিন্দুকুলচূড়ামণি বীরহাম্বির রাজা তদনুযায়ী ভাস্করের দ্বারা তিনটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া শ্রীমতিজাহ্নবাজীকে সমর্পণ করেন। শ্রীমতী জাহ্নবাজী ঐ তিনটী মূর্ত্তি লইয়া স্বর্গীয় গোপীজনবল্লভ গোস্বামীর সহিত বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করিয়া একটী মূর্ত্তি শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবজীর বামপার্শ্বে এবং অপর একটী শ্রীমদনমোহনজীর বামপার্শ্বে স্থাপন করাইয়া অবশেষে আপনাকে সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্রজের এক অনঙ্গমঞ্জরী জানাইবার জন্য শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর বামপার্শ্বে স্বয়ং বসিয়া প্রিয়াজীকে দক্ষিণ পার্শ্বে স্থাপন করেন। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীশ্রীগোপীনাথজীর "হোলী" বা দোলযাত্রা হয়।

উল্লিখিত তিনটি মন্দির বৃন্দাবনধামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা

প্রশংসনীয়। ঐ মন্দির ত্রয়ের খরচাদি কেবল বাঙ্গালী যাত্রিদিগের দ্বারাই চলিয়া থাকে বলিয়া বোধ হয় এরূপ ভেটের প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

আমাদিগের দেশে বিবাহাদি শুভকর্ম্মে এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্ম্মে যেরূপ সর্ব্বদেবময় গুরু এবং পুরোহিত বরণের নিয়ম আছে, এখানে তীর্থের কার্য্যে সেইরূপ নিয়ম প্রচলিত দেখা যায় এবং এইহেতু যাত্রিগণ, শ্রীরাধাগোবিন্দদেব-জীকে যেরূপ ভেট্ দেন, ঠিক সেইরূপ আপন আপন "গুরু-কুঞ্জে" যাইয়া ভেট্ ও পূজাদি করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে "ন পূজ্যতে গুরুর্যত্র নরাস্তত্রাফলাক্রিয়াঃ" অতএব এস্থলে গুরুকুঞ্জের ভেট্ না দিলে গুরুদেবের অমর্য্যাদা করা হয় এবং অপরপক্ষে তীর্থ ক্রিয়াদিও নিস্ফল হইয়া থাকে।

বিষ্ণু উপাসক যাত্রিগণ কোন্ পরিবারভুক্ত অগ্রে তাহা নিশ্চয় হইলে "গুরুকুঞ্জ" ঠিক হয়। অত্রধামে এক্ষণে অনেক গুরুকুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়, কোথায় কাহার ভেট্ হইবে বা করা উচিত বর্ত্তমান সময়ে তাহা ঠিক করা বড়ই সুকঠিন। বিশেষ বিবেচনা সহকারে আপন আপন গুরুকুঞ্জে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভেটাদি কার্য্য সমাধা করিবেন, কারণ আজকাল অনেক ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানহীন লোভী ব্যক্তিরা কিঞ্চিৎ অংশ পাইবার লোভে লুব্ধ হইয়া অপরিচিত যাত্রিদিগকে উপযুক্ত স্থানে ভেট্ না করাইয়া ('আপন আপন ইচ্ছা ও সুবিধা-মত) অন্যত্র ভেট্ করাইয়া থাকেন এবং অন্যপক্ষে অজানিত যাত্রিদিগকে গুরুত্যাগজনিত মহাপাপে লিপ্ত করেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি যে সকল মহাত্মারা কেবল অর্থ

উপার্জ্জনের জন্য এক একটী কুঞ্জ স্থাপন করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মাগণ যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহারা গুরুকুঞ্জের ভেট্ কোথায় এবং কিরূপভাবে করিয়াছিলেন সে বিষয়ের একটী চূড়ান্ত মীমাংসা করিলেই সকল ভ্রম দূর হইয়া যায়। স্থূলকথা—যে সকল মহাত্মাদিগের অত্রধামে কুঞ্জ আছে তাঁহাদিগের নিজ নিজ শিষ্যানুশিষ্যগণ যদ্যপি এই তীর্থে আইসেন, তাহা হইলে তাহাদিগের 'গুরুকুঞ্জের ভেট্' সেই কুঞ্জে অর্থাৎ যেখানে "মন্ত্রদাতা গুরু" অথবা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "বিগ্রহ বা ঠাকুর" আছেন সেই স্থানে ভেট্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অপরপক্ষে গুরুকুঞ্জ বা গুরু বর্ত্তমান না থাকিলে যাঁহার যেখানে 'শ্রীপাঠ' হইবে তাঁহার সেই স্থানেই গুরুকুঞ্জ-ভেটের কার্য্য সমাধা করা উচিত, ইহাই গুরুপাট্ বা গুরুকুঞ্জ ভেটের প্রকৃত পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যাত্রিদিগের সুবিধার জন্য নিম্নে যে কয়েক পঙ্ক্তি বিবরণ লিখিত হইল তদনুযায়ী ভেটের কার্য্য সমাধা করিলে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা থাকিবে না।

যাঁহারা ঠাকুর সুন্দরানন্দ, ঠাকুর বৃন্দাবনচন্দ্র, কাশীশ্বর গোস্বামী এবং রামানন্দি মহাশয়ের শিষ্য তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর মন্দিরে 'গুরুপাটের' ভেট্ দিবেন। যাঁহারা সনাতন গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য তাঁহারা শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউর মন্দিরে এবং যাঁহারা মা জাহ্নবাজী, ঠাকুর রামাই, অভিরাম গোপাল এবং গঙ্গাসন্তানের শিষ্য তাঁহাদিগের শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর মন্দিরে গুরুপাটের ভেট্ দেওয়া

কর্ত্তব্য। যাঁহারা নিত্যানন্দ বংশীয় ন্তার গাদি-গোস্বামী মহাশয়দিগের শিষ্য তাঁহারা শৃঙ্গারবট, খড়দহ গোস্বামী মহাশয়দিগের শিষ্যগণ ফলাহারি মা গোস্বামীনির কুঞ্জে এবং মালদহ গাদির গোস্বামী মহাশয়দিগের শিষ্যগণ সোনার-গৌরাঙ্গের মন্দিরে ভেট্ করিবেন। লেখা বাহুল্য শেষোক্ত দুইটি কুঞ্জ যখন ছিল না, তখন প্রথমোল্লিখিত আদি শৃঙ্গারবট মন্দিরেই সকল শ্রেণীর যাত্রিগণ গুরুপাট-ভেটের কার্য্য সমাধা করিতেন।

অদ্বৈতবংশীয় কৃষ্ণমিশ্র ধারার শিষ্যবর্গের নূতন সীতা-নাথ, এবং বলরাম ধারার শিষ্যবর্গের পুরাতন সীতানাথজীর মন্দিরে ভেট্ করা কর্ত্তব্য। নরোত্তম ঠাকুর, লোকনাথ গোস্বামী, বাম কপীনা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী এবং বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তীর শিষ্যগণ শ্রীশ্রীগোকুলানন্দজীর মন্দিরে ভেটের কার্য্য করিবেন। এইরূপ শ্যামানন্দ গোস্বামীর শিষ্যবর্গ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীর মন্দির, আচার্য্য প্রভু এবং চট্টরাজ সন্তানের শিষ্যবর্গ বংশীবটে আচার্য্য প্রভুর কুঞ্জে, গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্যনিচয় ধীরসমীরে গৌরীদাস পণ্ডিতের কুঞ্জে, বক্রেশ্বর পণ্ডিত মহাশয়ের শিষ্যগণ গোপাল গুরুর কুঞ্জে, নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্যবর্গ পুরাতন সহরে সরকার ঠাকুরের কুঞ্জে, ঠাকুর কনাইয়ের পরিবারবর্গ ব্যাসের ঘেরা ঠাকুর কানাইয়ের কুঞ্জে, বুতণীর শিষ্যবৃন্দ লক্ষ্মীকান্ত গোস্বামীর কুঞ্জে, কলিকাতা নিবাসী নবদ্বীপচাঁদ গোস্বামীর পরিবারবর্গ পতিতপাবন গোস্বামীর কুঞ্জে, গদাধর পণ্ডিত মহাশয়ের শিষ্যগণ গদাধর চৈতন্য কিম্বা দত্তসমাজে, জগদীশ

পণ্ডিত মহাশয়ের শিষ্যগণ জগদীশ পণ্ডিত মহাশয়ের কুঞ্জে এবং ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহাপ্রভুর শাখা মাধবাচার্য্য সন্তান গোস্বামীর চান্দুড়া, যশোদল ও সর্ষ্পুরের শিষ্য শাখা-গণের ছিপিগলিস্থিত মাধবাচার্য্যের কুঞ্জে "গুরুপাটের" ভেটাদি করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শৈব ও শাক্ত মতাবলম্বী যাত্রিগণ কেবল সেবাকুঞ্জের সন্নিকট পৌর্ণমাসীর মন্দিরে যেথানে বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন, তথায় ভেট্ করিবেন।

গুরু পাটের কার্য্য সমাপনান্তে যাত্রিগণ শ্রীরাধাদামোদরজী দর্শন করিবেন। মহাত্মা শ্রীবল্লভদেবের পুত্র শ্রীজীবগোস্বামীর দ্বারা শ্রীরাধাদামোদরজী স্থাপিত হইয়াছেন। এই মন্দিরে শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের সমাধি-স্থান আছে এবং প্রতি বৎসর শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয়ের উৎসব শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এবং শ্রীজীব গোস্বামীর উৎসব পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে হইয়া থাকে। ইহার পরে শ্রীশ্যামসুন্দর ঠাকুর দর্শন করিতে হয়। ধারেন্দা-বাহাদুর নিবাসী স্বর্গীয় কৃষ্ণমণ্ডলের পুত্র শ্রীশ্যামানন্দ মহাশয়ের দ্বারা শ্রীশ্যামসুন্দরজী, স্থাপিত হইয়াছেন। তৎপরে শ্রীরাধারমণজী দর্শন করিতে যাইবেন, দক্ষিণ দেশান্তর্গত ভট্টমারিগ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় মহাত্মা বেঙ্কট ভট্টজীর পুত্র গোপাল ভট্টজী দ্বারা শ্রীরাধারমণজী স্থাপিত হইয়াছেন। এই ঠাকুর পূর্ব্বে "শালগ্রাম মুর্ত্তি" ছিলেন। জনপ্রবাদ—মহাত্মা গোপাল ভট্ট গোস্বামী আপন অভিষ্টদেবকে উত্তম উত্তম বস্ত্রালঙ্কারাদিতে ভূষিত করিতে না পারায় সর্ব্বদা অতি

মনঃকষ্টে থাকিতেন। একদা শ্রীভগবান্ আপন সেবকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া শালগ্রাম হইতে দ্বিভুজ মুরলীধর ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তি ধারণ করতঃ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এখানে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সমাধি-স্থান আছে এবং প্রতি বৎসর আষাঢ়ী শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে উৎসব হইয়া থাকে।

অত্রধামে অপর একটী শ্রীরাধারমণজীর মন্দির আছে—যাহাকে লোকে "সাজীর মন্দির" বলিয়া থাকে। বাস্তবিক শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে ইহা দেখিবার একটী উপযুক্ত মন্দির। লক্ষ্ণৌ নিবাসী সাহ বিহারীলালের পুত্র সাহ কুন্দনলালজী প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সমস্ত মন্দিরটি শ্বেতপ্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সুনিপুণ কারিকরেরা মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে আপন আপন কারুকার্য্যের নিপুণতা দেখাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখে নাই। স্থূলকথা মন্দিরটী সর্ব্বাংশে শোভনীয়।

তদনন্তর যাত্রিগণ! শ্রীগোকুলানন্দজীর মন্দিরে যাইয়া শ্রীরাধাবিনোদ ঠাকুর দর্শন করিবেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত তালগেড়া গ্রামনিবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র মহাত্মা লোকনাথ গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা শ্রীরাধাবিনোদ ঠাকুর স্থাপিত হইয়াছেন। এখানে লোকনাথ গোস্বামিজীর এবং উহাঁর শিষ্য নরোত্তম দাস ঠাকুরের সমাধি-স্থান আছে। প্রতি বৎসর আষাঢ়ী কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে লোকনাথ গোস্বামিজীর এবং কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে নরোত্তম ঠাকুরের উৎসব হয়।

পূর্ব্বোক্ত শ্রীশ্রীরাধাদামোদর, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর এবং

শ্রীশ্রীগোকুলানন্দজী এই তিন মন্দিরে যাত্রিদিগকে এক আনা করিয়া ভেট্ দিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবৃন্দাবনধামে দর্শনোপযুক্ত আরও অনেক মন্দির আছে। অতএব যাত্রিগণ! তৎপরে শেঠজীর মন্দির দর্শন করিবেন। শেঠজীর মন্দিরে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়দিগের 'রঙ্গজী ঠাকুর' আছেন বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকেরা তদনুসারে 'রঙ্গজীর মন্দির' বলিয়া থাকেন। অনুমান সন ১৮৫৮ সালে স্বর্গীয় লক্ষ্মীচাঁদ শেঠের ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ এবং গোবিন্দদাস এই উভয় ব্যক্তির দ্বারা মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্য প্রথম আরম্ভ হয় এবং ছয় বৎসরের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমস্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া উক্ত 'রঙ্গজী ঠাকুরকে' বিরাজমান করেন। এই মন্দির দেখিতে ঠিক্ 'কেল্লার ন্যায়' এবং ইহার ভিতরে যে একটী বৃহৎ সোনার 'গরুড়স্তম্ভ' আছে তাহাকে আমাদের দেশের লোকেরা 'সোনার তালগাছ' বলিয়া থাকে, কিন্তু দেখিলে তালগাছের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। শেঠজীর মন্দিরে নানা উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে, তন্মধ্যে চৈত্রমাসের 'ব্রহ্মোৎসবের মেলা' সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। এই মেলা প্রতিবৎসর চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে আরম্ভ হইয়া একাদশী তিথিতে সমাপ্ত হয়। পঞ্চমী এবং দশমী তিথিতে বিস্তর টাকার আতসবাজী পোড়ান হয় বলিয়া দেশ দেশান্তর হইতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। এইহেতু রেলওয়ে কোম্পানি সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য দুই দিবস অতিরিক্ত স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। লাঠার এবং গজকচ্ছপের মেলাও নিতান্ত নিন্দনীয়

নহে। রঙ্গজী-ঠাকুর ব্যতীত মন্দিরের উভয় পার্শ্বে অনেক ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যায়।

অনন্তর যাত্রিগণ! মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কান্দি-গ্রাম নিবাসী স্বনামখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্রসিংহ ওরফে 'লালাবাবুর মন্দির' দেখিতে যাইবেন। সন ১৮১০ সালে পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মন্দির তৈয়ার হয়। স্বর্গীয় লালাবাবু শ্রীগোবর্দ্ধন-তীর্থে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তৎপরে 'শ্রীশ্রীরাধাগোপালজীর মন্দির' দর্শন করিতে যাইবেন। গোয়ালিয়রাধিপতি জিয়াজী সিন্ধিয়া মহারাজা অনুমান্ সন ১৮৬০ সালে মহাত্মা গিরিধারীদাস ব্রহ্মচারী মহাশয়ের উপ-দেশমত এই মন্দির তৈয়ার করেন এবং তদবধি 'ব্রহ্মচারিজীর মন্দির' বলিয়া খ্যাত হয়। প্রত্যহই সন্ধ্যার পর এখানে 'রাস' হইয়া থাকে। এই মন্দিরে রাধাগোপাল, হংসগোপাল এবং নিত্যগোপাল এই তিন ঠাকুরের দর্শনও করিতে হয়। তদনন্তর যাত্রিগণ! পূর্ব্বোক্ত সাহজীর মন্দির, শৃঙ্গারবট, সওয়ামন-শালগ্রাম, এবং নূতন ও পুরাতন সীতানাথজীর মন্দিরাদি দর্শন করিয়া বরাবর পুরাতন সহরে যাইয়া 'শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর' মন্দির দর্শন করিবেন। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর পুরাতন মন্দির অনুমান ১৫৮৪ সালে দিল্লীর বাদশাহের খাজাঞ্চি মহাত্মা সুন্দরদাসজীর দ্বারা নির্ম্মিত হয়; এবং নূতন মন্দির সন ১৭৭২ সালে গুজরাট নিবাসী স্বর্গীয় লল্লুভাই দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর পুরাতন মন্দিরের ন্যায় এ মন্দিরের উপরও নবাব আরঙ্গজেব বাদশাহের শুভ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। মথুরার অন্তর্গত বাদগ্রামনিবাসী মহাত্মা

হরিবংশ গোস্বামীর দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজী স্থাপিত হইয়াছেন। হোডেল গ্রামের নিকটবর্ত্তী চারথাভাল গ্রামের কোন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মহাত্মা হরিবংশজী এই ঠাকুরকে প্রাপ্ত হন। হরিবংশ গোস্বামিজীর প্রথম পুত্রের বংশধরগণ শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীর সেবাধিকারী হইয়া অদ্যাবধি অতি প্রশংসার সহিত সেবাকার্য্য করিতেছেন। তৎপরে যাত্রিগণ! স্বর্গীয় হরিদাস স্বামীর স্থাপিত শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারী ওরফে কুঞ্জবিহারিজীর মন্দির দর্শন করিতে যাইবেন। মহাত্মা হরিদাস স্বামীর শিষ্যগণ দ্বারা এই মন্দির প্রায় সত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়, নিধুবন হইতে হরিদাস স্বামিজী এই ঠাকুরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতি বৎসর কেবল অক্ষয় তৃতীয়ার দিবস ইঁহার চরণ দর্শন হইয়া থাকে।

তদনন্তর যাত্রিগণ! "নিধুবন ও নিকুঞ্জবন" নামক যে দুইটী প্রসিদ্ধ বন আছে তাহা দেখিবেন। নিকুঞ্জবনে শ্রীমতি রাধারাণী সতত বিরাজমানা থাকেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-স্থান বলিয়া জনশ্রুতি যে, রাত্রিকালে এই বনে কোন প্রকার জীব-জন্তু বাস করিতে পারে না। নিকুঞ্জবনের দ্বিতীয় দরজা উত্তীর্ণ হইলেই দক্ষিণ দিকে একটী শ্যামতমালের বৃক্ষ দেখিতে পাইবেন। সেই বৃক্ষের নানাস্থানে শালগ্রামশিলা-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অতি আশ্চর্য্য! অতএব যাত্রিগণ, সেই নয়নস্নিগ্ধকর মনমোহন মূর্ত্তি দর্শন করিতে যেন বিস্মৃত হইবেন না। সন ১৯০৫ সালে অযোধ্যাধিপতি প্রতাপ নারায়ণসিংহের কনিষ্ঠা রাণী ইহার চতুর্দ্দিকের প্রাচীর এবং সম্মুখ দ্বার বহু অর্থ ব্যয়ে প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মাণ

করাইয়া বিপুল যশলাভ করিয়াছেন। এই নিকুঞ্জবন মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় বানরদিগের জন্য ছোলাভাজা লইয়া যাইতে হয়। বনের ভিতর যে ললিতাকুণ্ড আছে প্রত্যেক যাত্রী সংকল্পান্তে তাহার জল স্পর্শ করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। শ্রীমতি রাধারাণীর শ্রীপটমূর্ত্তি দর্শন করিবার সময় দুই আনা করিয়া ভেট্ দিতে হয় এবং প্রথানুযায়ী ফুলশয্যা দিলে এক টাকা নয় আনা খরচ পড়িয়া থাকে। নিধুবনে বিশাখাকুণ্ড, সঙ্গীত বিশারদ তানসেনের গুরুদেব মহাত্মা হরিদাস স্বামীর সমাধি-স্থান এবং শ্রীভগবানের অনেক প্রকার লীলা-চিহ্ন দেখিতে পাইবেন। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের বংশী যখন চুরি হইয়াছিল, তখন শ্রীমতী রাধারাণী এই পবিত্র বনেই রাজ-পরিচ্ছদে বিভূষিতা হইয়া রাজ-ধর্ম্ম-মতে উহার বিচার করিয়াছিলেন।

অতঃপর যাত্রিগণ! একদিবস 'কেশীঘাটে' যাইয়া মস্তক মুণ্ডন করতঃ স্নানান্তে—পিতৃ উদ্দেশে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিবেন এবং শাস্ত্রানুযায়ী ব্রাহ্মণকে রজত, বস্ত্র ও গোদান করিবেন। শ্রীভগবান্ এই ঘাটে কেশী নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তদনুযায়ী কেশীঘাট নাম হইয়াছে। এই ঘাটে পিণ্ডদান করিলে গয়াধামে পিণ্ডদান তুল্য ফললাভ হয়। তৎপরে যাত্রিগণ! 'বংশীবট' দর্শন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বংশী বাজাইয়া গোপীগণকে একত্রিত করতঃ "রাসলীলা" করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ ধীর-সমীর, যমুনা-পুলিন, জ্ঞানগুদরী, রাধাবাগ, চৌষট্টি মহান্তের সমাধি-ক্ষেত্র এবং ব্রহ্মকুণ্ড দর্শন করতঃ বরাবর শ্রীমদন-

মোহনজীর মন্দির অতিক্রম করিয়া যেখানে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়-নাগকে নিপাতন করেন সেই পরম পবিত্র 'কালিয়হ্রদ' স্থান দর্শন করিতে যাইবেন এবং ফেরত আসিবার সময় পথিমধ্যে হেতমপুরাধিপতি মহারাজার প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীঅষ্টসখীর মন্দির' দর্শন করিতে কেহ ভুলিবেন না। উপরিলিখিত বিগ্রহাদি ও স্থানগুলি দর্শন করিবার সময় পাণ্ডাজীর উপদেশ মত প্রত্যেক স্থানে এক পয়সা করিয়া দিতে হয়।

যাত্রিগণ! উপরোক্ত দর্শন-কার্য্য শেষ হইলে একদিবস 'শ্রীশ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা' দিতে যাইবেন। সচরাচর লোকে ইহাকে 'পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা' বলে, কিন্তু এই পঞ্চ ক্রোশ এক্ষণে তিন ক্রোশে পরিণত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। পরিক্রমা কালীন সঙ্কল্প উপলক্ষে দ্বাদশঘাটে দ্বাদশটী পৈতা, সুপারী ও পয়সা লাগিয়া থাকে, এবং সঙ্গের পথ-প্রদর্শক ব্রজবাসীকে তাঁহার ভোজন ও দক্ষিণা বাবদ মোটের উপর চারি আনা কিম্বা ছয় আনা পয়সা দিতে হয়। অধিকাংশ যাত্রী প্রথম কেশীঘাট হইতে পরিক্রমণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ রাজঘাট, বরাহঘাট, কালিয়ঘাট, প্রস্কন্দনঘাট, সূর্য্যঘাট, গোপালঘাট, যুগলঘাট, বিহারঘাট, শৃঙ্গারঘাট, গোবিন্দঘাট এবং চীর বা চেন্‌ঘাট হইয়া পুনরায় কেশীঘাটে আসিয়া সমাপ্ত করেন। স্থূলকথা এক নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় সেই স্থানে আসিয়া পরিক্রমণ-কার্য্য সমাপ্তি করিতে হয়। পরিক্রমণ-কার্য্য শেষ হইলে শ্রীশ্রীগোপেশ্বর মহাদেবজীকে দর্শন করতঃ বাসায় যাইয়া বিশ্রামলাভ করিবেন। সন ১৮৯৫ সাল হইতে শ্রীযমুনায় চড়া পড়িয়া

যাওয়ায় সকল ঘাটগুলিই অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে।

তদনন্তর যাত্রিগণ! শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীকে যেরূপ ভেট্ দিয়াছিলেন সেইরূপ ভেট্ দিয়া শ্রীযমুনাজীর পূজা করিবেন এবং ক্ষমতানুযায়ী থালা, ঘটি, বাটি, শাড়ী, লোহা, শাঁখা, অলঙ্কার, দুগ্ধ, চাঁউল, মিষ্টান্ন, ধুপ, দীপ, সিন্দূর, পুষ্প, মালা এবং ফলাদি পূজার সামগ্রী দিবেন। যে সকল যাত্রী ঐ সকল উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইবেন তাঁহারা ব্রজবাসী পাণ্ডাজীকে অনুরোধ করিলে ব্রজবাসী মহাশয় তদনুযায়ী উপরোক্ত উপকরণাদির উচিত মূল্য গ্রহণ করতঃ সমস্ত দ্রব্যাদি দিয়া থাকেন। পূজা সমাপনান্তে কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া ব্রজবাসীর চরণ-পূজা-কার্য্য এই সঙ্গে করিয়া লইবেন। যে ঘাটে পূজা করিবেন, সেই ঘাটে খুচরা খরচ প্রায় দেড় আনা পড়িয়া থাকে।

শ্রীযমুনা-পূজা সমাপনান্তে যাত্রিগণ! শ্রীশ্রীবৃন্দাদেবীর পূজা করিবেন। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীবৃন্দাদেবীর দ্বারা রক্ষিত, অতএব শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া মূল বস্তুর পূজা করিতে কোন প্রকার ওজর আপত্য করিবেন না। শ্রীযমুনাজীর পূজা উপলক্ষে যে সমস্ত দ্রব্যাদির আবশ্যক হইয়া থাকে, শ্রীবৃন্দাদেবীর পূজাতে কেবল দুগ্ধ ব্যতীত আর অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যাদির আবশ্যক হয়, তবে দধি ও খই অতিরিক্ত লাগিয়া থাকে। অনেক স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, যাত্রিগণ কেবল শ্রীবৃন্দাদেবীর পূজার সামগ্রী আয়োজনের জন্য কুঞ্জবাসীকে মোটের উপর পাঁচসিকা দিয়া সমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত হন, কিন্তু যিনি পূজা করান তাঁহাকে তাঁহার

পারিশ্রমিক বাবদ দুই আনা কিম্বা যাত্রীর সংখ্যা বিশেষে আরও চারি আনা পৃথকরূপে দিতে হয়। শ্রীরাধাগোবিন্দ-দেবকে যেরূপ ভেট্ দিবেন, শ্রীবৃন্দাদেবীকেও ঠিক সেইরূপ ভেট্ দিতে হইবে। এই ভেট্ কুঞ্জবাসীর প্রাপ্য বলিয়া কুঞ্জে থাকার জন্য যাত্রিদিগকে পৃথকরূপে আর ভাড়া দিতে হয় না।

এই সমস্ত কার্য্যাদি শেষ হইলে যাত্রিগণ শ্রীগোপেশ্বর-মহাদেবজীর পূজা যথাবিহিতরূপে সমাধা করিবেন। প্রবাদ আছে শ্রীগোপেশ্বর মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক হইলে আদ্যাশক্তি ভগবতীর পরামর্শানুযায়ী শ্বেত-সখিবেশ ধারণ করিয়া যখন বংশীবটে রাস দেখিতে যান, তখন অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীমহাদেবজীর আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া প্রসন্নমনে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—হে মহাদেব! আপনার শুভাগমনে আজ আমরা সকলেই কৃতকৃতার্থ হইলাম, এবং অদ্য হইতে আপনি "গোপীশ্বর" নামে পূজিত হইবেন। অতঃপর যিনি যথাবিধিরূপে আপনার পূজা না করিবেন তাঁহার বৃন্দাবন-দর্শন এবং বাস নিষ্ফল হইবে। অতএব যাত্রিগণ! গোপেশ্বরের বা গোপীশ্বর মহাদেবজীর পূজা করিতে ক্ষণকালের জন্যও ইতস্ততঃ করিবেন না। তৎপরে যাত্রিগণ ব্রজবাসী এবং ব্রজবাসিনীকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণান্ত করিবেন এবং ব্রজবাসীর ভোজন-কার্য্য শেষ হইলে এক দিবস ব্রজবাসীর বাটীতে 'মাধুকরী' করিয়া শ্রীবৃন্দাবনের যাবতীয় দর্শনাদি ক্রিয়া হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীগুরুপাট বা গুরুকুঞ্জ, শ্রীযমুনা-পূজা এবং শ্রীবৃন্দাপূজা সর্ব্বসমেত এই ছয়টি ভেট্ সমানভাবে করিয়া পরিশেষে আপন আপন ব্রজবাসীর নিকট হইতে সদাচারে 'সুফল' গ্রহণ করতঃ হৃষ্টচিত্তে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিবেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দক্ষিণান্ত না করিলে যেরূপ ভোজন করাইবার কোন ফল হয় না সেইরূপ ব্রজবাসী ব্রাহ্মণের দ্বারা তীর্থ-কার্য্যাদি করাইয়া সুফল না লইলে সমস্ত কার্য্য বিফল হইয়া থাকে। অতএব ভগবদ্ভক্ত যাত্রিগণ! আপনারা প্রসন্নমনে যথাশক্তি প্রণাম দিয়া তীর্থ-গুরু মহাশয়ের নিকট হইতে 'সুফল' গ্রহণ করিবেন। সচরাচর যেরূপ দেখা যায় তাহাতে বোধ হয় যাঁহারা প্রথম শ্রেণীর ভেট্ করেন তাঁহারা 'সুফল' লইবার সময় পাণ্ডাজীকে পঁচিশ টাকা দিয়া থাকেন এবং যাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ লাল যাত্রী হন, তাঁহারা ষোল টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ দশ টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত দিয়া সুফল-কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং ইহাই প্রাচীন পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু হায়! বঙ্গদেশবাসী সুধীর ভক্তগণ নানা কারণে দুর্ব্বল, নিস্তেজ ও দরিদ্র হইয়া যাওয়ায় গোস্বামিদিগের আজ্ঞা-মত পূর্ব্বরূপ ভেট্ ও পূজাদি না করা সত্ত্বেও আপন আপন পাণ্ডাজীর নিকট হইতে সুফল লইবার সময় ইতস্ততঃ করিয়া থাকেন ইহা অতীব দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক সুফল গ্রহণান্তে ভাঙ্গি (মেথর) ও চৌকিদারী বাবদ প্রথানুযায়ী দুই আনা করিয়া প্রত্যেক যাত্রী কুঞ্জ-বাসীকে দিবেন এবং শ্রীবলদেবজীর ভোগার্থে চারি

আনা পয়সা পাণ্ডাজীর হস্তে দিয়া প্রফুল্লচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে ঝুলনযাত্রা এবং অন্নকূট এই দুইটী পর্ব্বই সর্ব্বপ্রধান। ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে যাত্রীর সংখ্যা অধিক হয় এবং অন্নকূট যাত্রায় অধিকাংশ ভদ্রলোকদিগের সমাগম হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া তিথি হইতে ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইয়া পৌর্ণমাসী তিথিতে সমাপ্ত হয় এবং কাত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে অন্নকূট যাত্রা হইয়া থাকে। ইহার পরদিন ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিবস মথুরাধামে যাইয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত বিশ্রামঘাটে স্নান করিবেন কারণ উক্ত দিবসে অত্যধিক জনতা হইয়া থাকে। ঝুলন ও অন্নকূট যাত্রার পরে অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্দিরে—রাইরাজা, সুবলবেশ, নৌকাখণ্ড এবং বনবিহারাদি লীলার দর্শন হইয়া থাকে। মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহার খরচ পূরণ জন্য কেবল নবাগত যাত্রিদিগের নিকট হইতে এক আনা করিয়া ভেট্ স্বরূপ লইয়া থাকেন।

অধিকাংশ যাত্রী ঝুলনযাত্রার পর বেলবন, ভাণ্ডীরবন, মান-সরোবর, গিরিগোবর্দ্ধন রাধাশ্যামকুণ্ড, গোকুল, মহাবন, বলদেবজী প্রভৃতি আদি তীর্থস্থান গুলি দর্শন করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন এবং অন্যপক্ষে অনেক যাত্রী ব্রজ-চৌরাশী-ক্রোশ পরিভ্রমণ-কার্য্য সমাধা করিয়া পরিশেষে স্বদেশ যাত্রা করিয়া থাকেন। পরিক্রমণ কালীন দ্বাদশবন ও দ্বাদশ উপ-বন দর্শন করিতে হয়, সচরাচর লোকে ইহাকে 'বন ভ্রমণ'

বলিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ব্রজ-চৌরাশীক্রোশের মধ্যে দ্বাদশ প্রতিবন এবং পঞ্চ সওয়ায় বন এই সতরটী আরো বন আছে পরিক্রমণ বা বনভ্রমণ কালীন দ্বাদশবন ও দ্বাদশ উপবন দর্শন হইয়া থাকে।

বন-ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

সচরাচর বনভ্রমণ কালীন যে সমস্ত বন দর্শন করিতে হয় তাহাই এ পুস্তকে যথাযৎ লিখিত হইল। দ্বাদশ বনের নাম যথা—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যবন, বহুলাবন, খদিরবন, ভদ্রকবন, ভাণ্ডীরবন, বেলবন, লোহবন বা লোহজঙ্ঘবন, মহাবন, এবং বৃন্দাবন। এই সমস্ত মূখ্য স্থানগুলি দর্শন করিবার সময় পথিমধ্যে যে সমস্ত বন ইহার আনুসঙ্গিক দর্শন হয় সেই সমস্ত বনাদি উপবন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বন-প্রদক্ষিণ অত্যন্ত কঠিন কার্য্য; কারণ পরিক্রমণ দিতে হইলে অনেক পরিশ্রম ও ব্যয় বাহুল্য হইয়া থাকে। পথে আহার্য্য দ্রব্যাদির সুবিধা না থাকায় যাত্রিগণকে শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে ২ সপ্তাহোপযোগী পুরাতন আতপ অথবা সিদ্ধ চাউল, দাল, তৈল, আলু ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য আবশ্যক মত সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। সঙ্গতিপন্ন যাত্রিগণ পাল্কী, ডোলী অথবা গরুরগাড়ী ভাড়া করিয়া বাসোপযোগী তাম্বু ও তৈজসাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। একখানি গরুরগাড়ী প্রতি রোজ একটাকা দুই আনা হইতে এক টাকা ছয় আনা হারে পাওয়া যায়, চার বেহারার ডোলী দেড় টাকা হইতে দুই টাকা এবং দুই বেহা-

রার ডোলী চার বেহারার ডোলীর অর্দ্ধেক ভাড়া দিতে হয়। পাল্কীভাড়া করিতে হইলে প্রতিরোজ আন্দাজ তিন টাকা হারে খরচ পড়িবে এবং পনর দিনের জন্য একটী তাম্বু পাঁচ কিম্বা ছয় টাকা পর্য্যন্ত ভাড়াতে পাওয়া যাইবে। যাহা হউক সকল সময় উল্লিখিত ভাড়ার নিয়ম একরূপ থাকে না, কম বেশী হইতে পারে; কিন্তু যাত্রিগণ ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন যে গাড়ী, তাম্বু, ডোলী এবং পাল্কীর বেহারাগণ কেবল রাধাশ্যামকুণ্ড, কাম্যবন, এবং নন্দগ্রাম, এই তিন স্থানে ভাড়া ব্যতীত পৃথক্‌রূপে খোরাকী পাইয়া থাকে। অপর-পক্ষে যাঁহারা পদব্রজে বন-ভ্রমণে যাইবেন তাঁহাদিগের পুঁটলি বা গাঁটরী বহন করিবার জন্য কোন চাকরের আবশ্যক হইলে তাহাকে প্রতিরোজ চারি আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত নগদ বেতন দিতে হইবে। যাহা হউক এ সমস্ত কার্য্য ব্রজবাসীর মারফত করাইলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে বলিয়া বিবেচিত হয়। বনভ্রমণ কালীন যে সমস্ত কুণ্ড পড়িবে প্রত্যেক কুণ্ডে সংকল্প উপলক্ষে সঙ্গের ব্রজবাসীকে একটী করিয়া পয়সা ও পৈতা দিবেন। দ্বাদশবন প্রদক্ষিণ করিলে মনুষ্যগণ দেহান্তে নরক যন্ত্রনা হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

অধিকাংশ যাত্রি নন্দোৎসবের পরদিবস দশমী তিথির মধ্যাহ্নে আহারাদি কার্য্য সমাপন করিয়া অপরাহ্ণ সময়ে 'বন-ভ্রমণ' উদ্দেশে যাত্রা করিয়া থাকেন এবং 'মথুরাধামে' পৌঁছিয়া তথাকার দীগদ্বরজার নিকটবর্ত্তী বজ্রনাভের প্রস্তুত ভূতেশ্বর মহাদেব তথা পাতালদেবীকে দর্শন করিয়া একদিন

এই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন। ইহাঁকে দর্শন করিলে ভগবানের মোক্ষ দর্শন জন্য পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং তিনি পাপী-দিগকে মোক্ষদান করিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে মথুরা তিন ক্রোশ ব্যবধান।

পরদিবস প্রাতেঃ মথুরা হইতে গমন করিয়া 'মধুবন' যাইবেন। ভগবান্ এই স্থানে গোচরণ-লীলা করিয়াছিলেন। মথুরা হইতে মধুবন দুই ক্রোশ ব্যবধান। মধুবনে মধুকুণ্ড ও কুণ্ডের পশ্চিমদিকে মহাপ্রভুর বিশ্রাম-স্থান এবং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিবেন। এই রমণীয় বিষ্ণুস্থান দর্শন করিয়া শ্রীযমুনাতে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয় এবং অন্যপক্ষে যাবতীয় তীর্থের ফল লাভ হইয়া থাকে। ভগবান এই বনে মধু নামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রজবাসিগণ মধুপূর্ণ বাটি দান পাইয়া থাকেন। এই বনের অর্দ্ধক্রোশ দূরে 'ধ্রুবটীলা'। একদা ধ্রুবজী নারদের উপদেশানুযায়ী এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। ধ্রুবটীলার অনতিদূরেই 'তালবন'। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামজী গোচারণ কালীন তালবনের সুপক্ক তাল ফলের সৌরভে মোহিত হইয়া তাল পাড়িতে আরম্ভ করিলে গর্দ্দভাকৃতি বন-রক্ষক মহাতেজস্বী ধেনুকাসুর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত তেজের সহিত বলরামের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে। এবম্বিধ দুর্ব্ব্যবহারে বলরাম ক্রোধান্বিত হইয়া ধেনুকাসুরের দুই পা ধরিয়া শূন্যমার্গে ঘুরাইতে ঘুরাইতে সজোরে তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করেন, ইহাতেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায় এবং অসুরের ভারে গাছের উপর গাছ পড়িয়া

ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সমস্ত বন তদবধি বৃক্ষহীন হয়। তালবন দর্শন করিয়া তত্রস্থ কোন কূপ অথবা কুণ্ডে স্নান করিলে মানবগণ কৃতকৃতার্থ হইয়া দেহান্তে দেবত্ব প্রাপ্ত হন। তৎপর 'কুমুদবন' যাইবেন, কুমুদবনের স্বচ্ছ-সলিলা সরোবরে ভগবান্ জলকেলী করিয়াছিলেন। এখানে যে শ্যাম তমালবৃক্ষ আছে তাহার নীচে মহাপ্রভুর স্থান এবং কপিলমুনি দর্শন করিবেন। কুমুদবন দর্শনে মনুষ্যগণ বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। যাত্রিগণ! কুমুদবনের দর্শন-কার্য্য সমাপনান্তে পুনরায় মধুবনে ফিরিয়া আসিয়া একরাত্রি বাস করিবেন।

পরদিন অতি প্রত্যুষে "শান্তনকুণ্ড" উদ্দেশে যাত্রা করিবেন। মধুবন হইতে শান্তনকুণ্ড দুই ক্রোশ এবং মথুরা হইতে দেড় ক্রোশ ব্যবধান। শান্তনু রাজা নিজ ভক্তিপ্রভাবে এই স্থানে গঙ্গামাতাকে আনাইয়া (পুত্র কামনার্থ) তপস্যা করিয়াছিলেন এবং গঙ্গামাতারই অনুগ্রহে 'ভীষ্ম' সন্তানকে প্রাপ্ত হন; এবং এইহেতু যে সকল স্ত্রীলোকদিগের সন্তান সন্ততি হয় না তাহারা কেবল রবিবার দিবস শান্তনবিহারীর নিকট আসিয়া 'পুত্রের' জন্য কামনা করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় লোকেরা ইহাকে 'সাতিয়া' কহে। ইহার দুই ক্রোশ দূরে "বহুলাবন"। কথিত আছে যে, বহুলা নামক কোন গাভী ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে শ্রীভগবান্ উক্ত হিংস্র জন্তুকে বিনাশ করতঃ গাভীকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত গাভীর নামানুযায়ী বহুলাবন নাম হইয়াছে এবং এইহেতু ব্রজবাসিগণ এখানে গরু দান পাইয়া থাকেন। এই রমণীয় বন দর্শনে মনুষ্যগণ দেহান্তে অগ্নিলোকে গমন করে। এখানে যে কৃষ্ণকুণ্ড

আছে তাহার পাড়ের উপর মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান ও বহুলাবনবিহারী এবং মদনমোহন ঠাকুরকে দর্শন করিতে হয়। তৎপরে গ্রামের ভিতর যাইয়া শ্রীশ্রীসীতারামের মন্দির দর্শনান্তে যাত্রিগণ ঐ দিবস বহুলাবনেই অবস্থিতি করিবেন।

পর দিবস প্রাতে বহুলাবন হইতে যাত্রা করিয়া দেবারাধ্য 'শ্রীশ্রীরাধাশ্যামকুণ্ড' যাইবেন। যাইবার সময় পথিমধ্যে যে রালগ্রাম আসিবে তাহার দক্ষিণ দিকে শ্রীবলদেবজী তথা বলদেবকুণ্ড দর্শন করিবেন। বৃন্দাবন ধামের ন্যায় এখানেও অনেক দেবতাদির মন্দির আছে এবং তন্মধ্যে কোন কোন মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ ঠাকুর দর্শন জন্য সামান্যরূপ ভেট্ লইয়া থাকেন। রাধাশ্যামকুণ্ডের অতি সন্নিকট আরিট্ গ্রামে কংসচর অরিষ্টাসুরের বাসস্থান ছিল, উক্ত অসুর বৃষরূপ ধারণ করিয়া অত্রস্থ ব্রজবাসিদিগের উপর অত্যধিক দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলে যখন ভগবান্ রাধাশ্যামকুণ্ডবাসিদিগের মঙ্গল কামনায় উক্ত বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করেন, তখন শ্রীমতি রাধিকা অন্যান্য গোপীগণের সহিত একমত হইয়া বৃষাকৃতি অসুরকে হত্যা করা অপরাধে শ্রীকৃষ্ণকে পাতকী বলায় ভগবান্ উঁহাদিগের অনুরোধে নিজ পাপ মোচন হেতু এই স্থানে পদাঘাত দ্বারা পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করতঃ সর্ব্বতীর্থকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডে স্নান করিলে রাজসূয় অশ্বমেধের ফল হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এখানে স্নান করিলে মানবগণ শ্রীমতি রাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হন এবং সর্ব্বতীর্থ গমনের ফল

লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমতি রাধিকা সূর্য্য পূজার কারণ যে কুণ্ডের তীরে বসিয়া মালা গাঁথিতেন, সেই মহ্লারকুণ্ড এবং ললিতাকুণ্ড বর্ত্তমান সময়ে লুপ্তাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। জনশ্রুতি পূর্ব্বে রাধাশ্যামকুণ্ডও লুপ্তাবস্থায় ছিল, এমন কি যখন মহাপ্রভু তীর্থপর্য্যটনে এখানে আইসেন, তখন তিনিও এখানকার মৃত্তিকা লইয়া তিলক সেবা করিয়াছিলেন; তৎপশ্চাৎ সর্ব্ব বিষয়ত্যাগী রাজবংশীয় মহাত্মা রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাশয় ভগবানের স্বপ্নাদেশানুযায়ী কোন ভক্তের সাহায্যে রাধাশ্যামকুণ্ডের পঙ্কোদ্ধার করেন। উভয় কুণ্ডের মধ্যস্থিত তীরে রত্নবেদিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন এবং পাবন ঘাটের উপরি উক্ত দাস গোস্বামী মহাশয়ের সমাধি স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বহুলাবন হইতে রাধাশ্যামকুণ্ড প্রায় চারি ক্রোশের উপর রাস্তা হইবে। যাত্রিগণ! এই স্থানে একরাত্রি বাস করিবেন।

পরদিবস প্রাতে যাত্রিগণ! রাধাশ্যামকুণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে প্রথম কুসুমসরোবর, তৎপরে ক্রমশঃ নারদকুণ্ড; গোয়ালপোখর, কিলোলকুণ্ড এবং সূর্য্যকুণ্ড দর্শন করিয়া বরাবর গোবর্দ্ধনতীর্থের মানসগঙ্গাতে যাইয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নানান্তে গোপাল মুকুট বা গিরি গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ দর্শন করিবেন। মথুরা হইতে গোবর্দ্ধন সাড়ে ছয় ক্রোশ এবং রাধাশ্যামকুণ্ড হইতে দেড় ক্রোশ ব্যবধান। ভক্তমালে উক্ত আছে যে—

"কৃষ্ণের দ্বিতীয় কলেবর গোবর্দ্ধন।
গোবর্দ্ধন দরশনে কৃষ্ণ দরশন॥

গোবর্দ্ধন শিলা পূজা কৃষ্ণের পূজন।
গোবর্দ্ধন শিলারূপে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥"

গোবর্দ্ধন মাহাত্ম্য অতি বিস্তার বলিয়া সংক্ষেপে এই দৃষ্টান্তটি দেওয়া হইল। অনন্তর যাত্রিগণ! গোবর্দ্ধনে হরিদেবের প্রসিদ্ধ প্রাচীন মন্দির, চক্রেশ্বর বা চাকৃলেশ্বর মহাদেব, উদ্ধবকুণ্ড, মনসাদেবী, পাপমোচন, গোমোচন, ধর্ম্ম-রোচন, ঋণমোচন এবং গোবিন্দকুণ্ড তথা শ্রীগোবিন্দ-দেবজী দর্শন করিবেন। গোবিন্দকুণ্ডে স্নান করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, গোবর্দ্ধনতীর্থে আসিয়া যাঁহারা মানসগঙ্গায় স্নান, হরিদেবের দর্শন, গোবর্দ্ধন পরিক্রমা এবং অন্নকূটযাত্রা দর্শন করেন, তাঁহাদিগকে এই মায়াময় সংসার-ক্ষেত্রে পুনরায় আসিতে হয় না এবং অপর-পক্ষে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। তৎপরে যাত্রিগণ! আনিয়োর বা আনোরগ্রাম, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, নবলকুণ্ড, যুগলকুণ্ড, পুছরিলঠা বা পুছরিগ্রাম, ঐরাবতকুণ্ড, সুরভিকুণ্ড ও হরিজীকুণ্ড দর্শন করিয়া যতিপুরা গ্রামে যাইবেন এবং তথায় গোকুল নিবাসী গোস্বামীদিগের স্থাপিত গিরিগোপালজী দর্শনান্তে দানঘাটী হইয়া পুনরায় গোবর্দ্ধনে ফিরিয়া আসিয়া এক রাত্রি বাস করিবেন।

পরদিবস প্রাতে যাত্রিগণ! গোবর্দ্ধন হইতে যাত্রা করিয়া "লাঠাবন বা দীগ্" যাইবেন। যাইবার সময় পথিমধ্যে প্রথম গুলালকুণ্ড তৎপরে বেহেজগ্রামে বলদেবকুণ্ড তথা শ্রীবলদেবজী দর্শন করতঃ লাঠাবনে যাইতে হয়। গোবর্দ্ধন হইতে বেহেজ গ্রাম সাড়ে তিন ক্রোশ এবং বেহেজ গ্রাম হইতে লাঠাবন দেড়

ক্রোশ ব্যবধান। লাঠাবন ভরতপুর রাজ্যের অধীন। লাঠাবনের কেল্লা অতি সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য এবং রাজমহাল বা নন্দভবনও দেখিবার উপযুক্ত স্থান। এই মহালের চতুষ্পার্শ্বে মনোহর উদ্যান এবং উদ্যানের উভয় পার্শ্বে পাকাঘাট সংযুক্ত দুইটী গভীর পুষ্করিণী আছে। উক্ত বাগান অগণ্য ফোয়ারার দ্বারা পরিপূর্ণ। যে দিবস যাত্রিগণ লাঠাবনে পোঁছেন, সেই দিবস কেবল যাত্রিদিগের আনন্দবর্দ্ধন জন্য নন্দভবন-উদ্যানে একটি বৃহৎ মেলা হয় এবং অপরাহ্ন সময়ে উদ্যানস্থিত ফোয়ারা সকল হইতে শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় মেঘগর্জ্জনবৎ শব্দে অজস্র জল উদ্গীরণ হইতে থাকে। উক্ত দিবস ঘটনাস্থলে মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকেন এবং মেলা দর্শনান্তে যাত্রিগণ এখানে একরাত্রি বিশ্রাম লাভ করেন বলিয়া রাত্রিকালে যাহাতে চোরের উপদ্রব অথবা যাত্রিদিগের অন্য কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য দস্তুর মত পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। লাঠাবনের চকবাজারে লছমনজীর (লক্ষ্মণ) মন্দির এবং রূপসাগরের তীরের উপর বিহারিজীর এবং সীতারামজীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিবেন।

যাত্রিগণ! পরদিবস প্রাতে লাঠাবন হইতে কাম্যবন যাত্রা করিবেন। যাইবার সময় পথিমধ্যে প্রথম সুদামাকুণ্ড ও তৎপরে বদ্রিকুণ্ড দর্শন করিতে হয়। এই বদ্রিকুণ্ডে বদ্রিনাথজী তপস্যা করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চাদ্দিকে কুণ্ডরূপী অলকানন্দা গঙ্গা বিরাজমানা আছেন। বদ্রিকুণ্ডে যাইয়া তত্রস্থ চতুর্ভুজরূপী বদ্রিনারায়ণকে যিনি দর্শন করেন, তাঁহার বদ্রিকাশ্রম গমনের ফল লাভ হয়। ইহার পরেই কৃষ্ণপ্রিয়-

স্থান 'কাম্যবন'। দীগ্ হইতে কাম্যবন সাড়ে ছয় ক্রোশ ব্যবধান। কাম্যবন হইতে মহাবনের সন্নিকট ক্ষীরসাগর বা বলদেবজী পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তা পড়িবে বলিয়া যাত্রিদিগকে সতর্ক করা যাইতেছে যে, যখন এখান হইতে কাঁচা রাস্তায় চলিবেন, তখন গক্ষুর ও বাবলা কাঁটা যাহাতে পায়ে বিদ্ধ না হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। পূর্ব্বে কাম্যবন জয়পুর রাজ্যের অধীন ছিল, এক্ষণে ভরতপুর রাজ্যের অধীনে আছে। কাম্যবনের বাহির সীমানায় যে বিমলাকুণ্ড নামক তীর্থ আছে, তাহার সমীপবর্ত্তি স্থানে যাত্রিগণ আপন আপন বাসা লইবেন। যে কোন ব্যক্তি কাম্যবন-তীর্থে যাইয়া তত্রস্থ বিমলাকুণ্ডে বিশুদ্ধ চিত্তে স্নান করতঃ শ্রীমতী বিমলাদেবী তথা ব্রজনাভের প্রস্তুত শ্রীকামেশ্বর মহাদেবজীকে দর্শন করেন তাঁহার সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হইয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় এবং দেহান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক যাত্রিগণ! প্রথমতঃ বিমলাকুণ্ডে সংকল্পান্তে স্নান করিয়া শ্রীমতী বিমলাদেবীকে দর্শন করিবেন। তৎপরে গ্রামের ভিতর যাইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ তথা শ্রীবৃন্দাদেবী এবং জগন্নাথ ও মহাপ্রভুর দর্শন করিবেন। দর্শন করিবার সময় চারি আনা করিয়া ভেট্ দিতে হয়। জনশ্রুতি, বৃন্দাবনধামে যে গোবিন্দদেবজীর পুরাতন মন্দির আছে, পূর্ব্বে উহা সাত তলা ও নয় চূড়া যুক্ত ছিল এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সর্ব্বোচ্চ চূড়োপরি সওয়ামণ ঘৃতের একটী প্রদীপ জ্বলিত। একদা উক্ত দীপশিখা আরঙ্গজেব বাদশাহ বাহাদুরের দৃষ্টিগোচর হইলে অমাত্যবর্গকে ঐ দীপশিখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে,

বৃন্দাবনগ্রামে গোবিন্দমন্দিরের উপর ঐ প্রদীপ নিত্য জ্বলিয়া থাকে, তখন হিন্দুদেবতাবিদ্বেষী কালাপাহাড় নামক প্রধান সেনাপতি বাদশাহ বাহাদুরের অনুমত্যনুসারে অপর একজন সেনাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া উহার মূলচ্ছেদ জন্য হুকুমজারী করেন। এবম্বিধ আকস্মিক ধর্ম্মপীড়ন ও শোকজনক ঘটনা ভগবদ্ভক্ত জয়পুরাধিপতি মহারাজের কর্ণগোচর হইলে, পাছে মুসলমান কর্ত্তৃক দেবতাদি স্পৃষ্ট হইয়া ধর্ম্ম নষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি আপন অভীষ্ট দেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজী ও অন্যান্য দেব-দেবীকে অনতিবিলম্বে রথগাড়ীতে বসাইয়া নিজ রাজ্য জয়পুরাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে যখন কাম্যবন গ্রামে উপস্থিত হন তখন শ্রীবৃন্দাদেবীর রথগাড়ীর চাকা একেবারে অচল হইয়া রথের গতি বন্ধ করে। সর্ব্বগুণান্বিত ধার্ম্মিক প্রবর মহারাজাধিরাজা এবম্বিধ বিপদ্‌জালে পতিত হইলে স্তবস্তুতি দ্বারা যখন জানিতে পারিলেন যে, শ্রীমতি বৃন্দাদেবী "ব্রজধাম" ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছুক, তখন মহারাজ উপায় বিহীন হইয়া তত্রস্থ কোন দেওয়ানজীর পরিত্যক্ত একটী সাত মহালের পুরাতন বাটিতে যথারীতি ভোগরাগের বন্দোবস্ত করতঃ দুঃখিতান্তঃকরণে শ্রীমতী বৃন্দাদেবীকে রাখিয়া অন্যান্য দেব-দেবীকে স্বরাজ্যে লইয়া যান। মহারাজ নিজরাজ্যে পৌঁছিবামাত্রই স্বপ্নাদেশ পাইলেন যে, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবজীর প্রসাদ ব্যতিত শ্রীমতি বৃন্দাদেবী তিন চারি দিবস হইতে অনাহারে বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, অতএব যাহাতে অতি স্বরায় প্রসাদের বন্দোবস্ত হয় এমত বিহিত উপায় হওয়া আবশ্যক। এইরূপ স্বপ্নাদেশ হইলে

মহারাজের সংগ্রাম-সময় যে শ্রীগোবিন্দ-মূর্ত্তি তাঁহার সঙ্গে থাকিত তাঁহাকেই শ্রীমতি বৃন্দাদেবীর নিকট স্থাপন করাইয়া উত্তমরূপ ভোগরাগাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আন্দাজ ১৮৮৬সালে উক্ত শ্রীমূর্ত্তি ঝুলনযাত্রা উৎসবের সময় খণ্ডিত হইয়া যাওয়ায় উহার পরিবর্ত্তে ঐরূপ অন্য একটী শ্রীমূর্ত্তি জয়পুর রাজ্য হইতে আনাইয়া রাখা হয়। লেখা বাহুল্য গ্রন্থকর্ত্তা যখন ঐ দেবোত্তর ষ্টেটে ম্যানেজার ছিলেন তখন বিশেষ উৎসাহে ও সুকৌশলে এবং অতি অল্পব্যয়ে শ্রীশ্রী-রাধাগোবিন্দদেবজীর শ্রীমন্দির নূতনভাবে নির্ম্মাণ করায় কাম্যবনবাসী মাত্রেরই আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদের ভাজন হন।

অনন্তর যাত্রিগণ! শ্রীমদনমোহন, গোপীনাথ, কামেশ্বর-মহাদেব, পঞ্চপাণ্ডব, ধরমকুণ্ড এবং পঞ্চতীর্থ দর্শন করিবেন, তৎপরে রামেশ্বর মহাদেব তথা লঙ্কাকুণ্ড বা সেতুবন্ধ,লুক্লুক্-কুণ্ড (ভগবানের চোক বাঁধাবাঁধি খেলার স্থান) ছোট চরণ-পাহাড়ী, মহোদধকুণ্ড, পিছল শিলা (ভগবান্ এখানে গড়ানিয়া খেলা খেলিতেন) যমরাজজী, ভৌমাসুরের গুফা এবং ভোজন-থালি দর্শন করিবেন। ব্রজবাসিগণ এখানে মিষ্টান্ন পরিপূর্ণ থালা দান পাইয়া থাকেন। ভোজনথালির সম্মুখে যে কৃষ্ণকুণ্ড আছে তাহা দর্শন করিয়া কেল্লার উপরে যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলিবার বৈঠক্ দেখিতে যাইবেন। এতদ্দেশীয় লোকেরা ইহাকে 'চৌরাশী খাম্বা' কহে। তৎপরে গোকুলচন্দ্রমাজী দর্শন করতঃ আপন আপন বাসায় যাইয়া বিশ্রাম লাভ করিবেন।

কাম্যবনে অনেক তীর্থ ও লীলাস্থলী আছে, তন্মধ্যে যে-গুলি বিশেষ আবশ্যকীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় কেবল তাহাই উপরে লিখিত হইল। কাম্যবন তীর্থে যাত্রিগণ দুই রাত্রি বাস করিয়া থাকেন।

কাম্যবনে দুই রাত্রি বাস করিয়া পরদিবস যাত্রিগণ! বৃষভানু রাজার রাজধানী 'বর্ষাণগ্রাম' উদ্দেশে যাত্রা করিবেন। বর্ষাণগ্রাম যাইবার সময় পথিমধ্যে প্রথম কাণছেদনকুণ্ড দর্শন করিতে হয়, এখানে ব্রজবাসীরা কাণের মাকড়ী দান পাইয়া থাকেন। তৎপরে 'কদম্বখণ্ডী' দেখিবেন, শ্রীকৃষ্ণ এই কেলী-কদম্বসুশোভিত সুরম্য বনে শ্রীমতি রাধিকা ও সখীদিগের সহিত পাশা খেলিয়াছিলেন। কেহ কেহ এই বনকে 'নাগা-জীর কদম্বখণ্ডী' বলিয়া থাকেন। ইহার পর রত্নকুণ্ড ও কৃষ্ণ-কুণ্ড হইয়া 'আল্‌তাপাহাড়ী' দর্শন করিবেন। কথিত আছে শ্রীমতি রাধারাণী এখানে চরণে আল্‌তা পরিয়াছিলেন। এবং অদ্যাবধি পাথরের উপর আল্‌তার রঙ্গের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ রঞ্জিত প্রস্তরকে চিত্র-বিচিত্র শিলা কহিয়া থাকেন। তৎপরে 'দেহকুণ্ড' যাইবেন। এই স্থানে শ্রীমতি রাধারাণী কোন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে তাহার ভিক্ষা পূরণ জন্য আপন দেহ দান করায় শ্রীকৃষ্ণ ঐ ব্রাহ্মণকে শ্রীমতির দেহ পরিমিত স্বর্ণ দান দিয়া শ্রীমতির দেহদান ফেরত লয়েন এবং এই হেতু ব্রজবাসিগণ এখানে স্বর্ণ দান পাইয়া থাকেন। যাহাহউক যাত্রিগণ! ইহার পর বলদেবজী ও নূপুরবৃক্ষ এবং গেঁদকুণ্ড দর্শন করিয়া বরাবর বর্ষাণাভিমুখে যাইবেন এবং বর্ষাণগ্রামে পৌঁছিয়া তত্রস্থ বৃষভানু রাজার

নামানুযায়ী যে 'ভানুখোর' নামক পুষ্করিণী আছে তাহার তীরের উপর আপন আপন বাসা মনোনীত করিয়া লইবেন। এই পুষ্করিণী পণ্ডিতাগ্রগণ্য রূপরাম কাটরা ব্রাহ্মণের দ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং ইহার তটোপরি একটী প্রীতিপ্রদ জল-মহাল আছে। বর্ষাণায় গোয়ালিয়রাধিপতি সিন্ধিয়া মহারাজের লাড়লীজীর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। কাম্যবন হইতে বর্ষাণগ্রাম সাড়ে তিন ক্রোশ ব্যবধান। যে দিবস যাত্রিগণ এই স্থানে আইসেন সেই দিবস তৃতীয় প্রহরের সময় বর্ষাণগ্রাম পরিক্রমা ও তৎসঙ্গে দর্শনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। পরিক্রমা কালীন পথিমধ্যে ময়ূরকুণ্ড, শ্বাসকুণ্ড এবং দোহনিকুণ্ড দর্শন করিতে হয়, দোহনিকুণ্ডে জল নাই কিন্তু কুণ্ডের মধ্য-স্থলে যে কয়েকটী কেলীকদম্বের বৃক্ষ আছে, উহাদের পাতা ঠিক্ ঠোঙ্গার ন্যায় আকৃতি। তৎপরে গহ্বরবন অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতোপরি উঠিতে হয়, উঠিবার সময় দানগড় নামক স্থানে ব্রজবালক ও বালিকাগণ ভিক্ষার জন্য যাত্রিদিগকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়া থাকে। দানগড়ে দানবিহারীকে দর্শন করিয়া মান্‌গড় যাইতে হয়। মানগড়ে বর্ত্তমান জয়পুরাধিপতি মাধবসিংহজী মহারাজাধিরাজ সম্প্রতি বহু অর্থ ব্যয়ে অন্য একটী লাড়লীজীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়ায় আপন জীবনের যে একটী স্মৃতিচিহ্ন জগতে রাখিলেন তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ইহার সম্মুখ পাহাড়ে ময়ূরকুটি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক যাত্রিগণ! কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে পাহাড়ের মধ্যে এমন একটী সংকীর্ণ রাস্তা দেখিতে পাইবেন যেন দুইটী পাহাড় একত্রে সম্মিলিত

হইয়া বিশ্বরচয়িতার কারুকার্য্যের অপূর্ব্ব মহিমা প্রদর্শন করিতেছে। ঐ গলির মতন রাস্তাকে ‘সাঁকরীখোর’ কহে, তৎপরে পাহাড়ের উপর উঠিয়া লাড়লীজীর মন্দিরে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শনান্তে ক্রমশঃ বৃষভানু, কীর্ত্তিদা, মহিভানু, অষ্টসখী ও সুদামাদির মূর্ত্তি দর্শন করণান্তর আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বাসায় যাইয়া একরাত্রি এই স্থানেই বিশ্রাম লাভ করিবেন। বর্ষাণগ্রামে শ্রীকৃষ্ণ দানলীলা করিয়াছিলেন ও শ্রীমতি রাধিকার মানভঞ্জন হইয়াছিল এবং শ্রীমতি রাধারাণী বয়ঃসন্ধিকালে সখীদিগের সহিত অনেক প্রকার বিলাস-ক্রীড়া করিয়াছিলেন, এই হেতু দানগড়, মানগড় ও বিলাসগড় এই তিন স্থান মুখ্য বলিয়া অনুমিত হয়।

যাত্রিগণ! পরদিবস প্রাতে নন্দগ্রাম যাত্রা করিবেন। যাইবার সময় পথিমধ্যে প্রিয়াকুণ্ড বা পিরিপোখর এবং গাজি-পুরের সন্নিকট প্রেমসরোবর তথা প্রেমবিহারীজিকে দর্শন করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনস্থান “সঙ্কেতবট্ বা গোপীবন” যাইবেন। সঙ্কেতবটে সঙ্কেতবিহারী দর্শন করতঃ কৃষ্ণকুণ্ড, যশোদাকুণ্ড এবং বিহ্বলকুণ্ড হইয়া ‘ঘোলমথন’ যাইতে হয়, এই ঘোলমথনের সন্নিকট ঝাউবনে হাউ স্থান দেখিবেন। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বাল্যাবস্থাতে শ্রীমতি যশোদা মাতার কথা অবজ্ঞা পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিলে অথবা গৃহে দৌরাত্ম্য বা ক্রন্দন করিলে শ্রীমতি যশোদামাতা উল্লিখিত ভয়সূচক শব্দ “ঝাউ-বনে-হাউ” আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভয় দেখাইতেন, অদ্যাপি একটি প্রস্তর নির্ম্মিত ব্যাঘ্র মূর্ত্তি ঐ স্থানে বর্ত্তমান আছে। এই স্থান অতিক্রম করিবা মাত্রই

যাত্রিগণ 'নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম' পৌঁছিবেন। বর্ষাণ হইতে সঙ্কেতবট্ এক ক্রোশ এবং সঙ্কেতবট্ হইতে নন্দগ্রাম প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশের উপর রাস্তা হইবে। নন্দগ্রামে পাবন সরোবর নামক যে প্রসিদ্ধ সরোবর আছে তাহার চতুর্দ্দিকে যাত্রিগণ অবস্থিতি করিয়া থাকেন। যাঁহারা নন্দগ্রামে আসিয়া পাবনসরোবর ও কৃষ্ণকুণ্ডে স্নান করতঃ শ্রীনন্দজী তথা শ্রীমতি যশোদারাণী এবং শ্রীনন্দীশ্বর মহাদেবজীকে দর্শন করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ পাবনসরোবর হইতে গাভীদিগের পানার্থ জল লইতেন এবং এই সরোবর, বিশাখা সখীর পিতা পাবন আহীরের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার নামানুযায়ী পাবনসরোবর নাম হইয়াছে। মহিভানু রাজা অপুত্রক অবস্থায় নন্দীশ্বর মহাদেবজীর নিকট পুত্র প্রার্থনা করায় বৃষভানু পুত্রকে লাভ করেন। সন ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে পাবন সরোবরের ঘাটগুলি বর্দ্ধমানাধিপতির মহারাণীর দ্বারা তৈয়ার হয়। যাহা হউক যাত্রিগণ! টিলার উপর উঠিয়া তথায় শ্রীনন্দজী ও শ্রীমতী যশোদারাণী, শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামজী দর্শন করিবেন। তৎপরে ক্রমশঃ নৃত্যগোপাল, নৃসিংহ, গিরিধারী, রাধামোহন, যশোদানন্দন ও নন্দনন্দন দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিবেন; এবং তৎপরে মধ্যাহ্নে আহারাদি কার্য্য সমাপনান্তে তৃতীয় প্রহরে পুনরায় বাসা হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম কৃষ্ণকুণ্ড তৎপরে ক্রমশঃ কদম্বকুণ্ড, বলদেবকুণ্ড, কিশোরীকুণ্ড তথা কিশোরীবট্ দর্শন করিয়া পাড়রগঙ্গা যাইবেন এবং তথায় জটিলা-কুটিলা ও আয়ান ঘোষের বাটী এবং তাঁহাদিগের

প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিবেন। এই স্থান 'যাওবট' বা যাবট্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রজবাসিদিগকে এই স্থানে পরিতোষ পূর্ব্বক লাড়ু খাওয়াইতে হয়। এতদ্ব্যতীত নন্দগ্রামে আরও অনেক তীর্থ আছে যাহা সময়াভাবে কেহ দর্শন করেন না। অতএব যাত্রিগণ দর্শনাদি কার্য্য শেষান্তে নন্দগ্রামে একরাত্রি বাস করিবেন।

পরদিবস প্রাতে নন্দগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া যত্রিগণ 'শেষশায়ী' যাইবেন। যাইবার সময় পথিমধ্যে প্রথম শ্বাসকুণ্ড ও তৎপরে চিত্তরঞ্জনকারী কোকিলবন তথা শ্রীকোকিল-বিহারী এবং বঠেণগ্রামে বলদেবকুণ্ড ও শ্রীবলদেব বিহারীজী দর্শন করতঃ নূপুরবৃক্ষ পরিবেষ্টিত 'বড়চরণ-পাহাড়ীতে' যাই-বেন। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণকালীন এই পবিত্র পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া এরূপভাবে বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন যে, বংশীর স্বরে জীব জন্তু দূরের কথা, কিছুকালের জন্য শিলা পর্য্যন্তও গলিয়া গিয়াছিল এবং এই হেতু পাহাড়ের নির্দ্দিষ্ট শিলাতে শ্রীভগবান্ ও ধেনু বৎসাদির পদচিহ্নাদি অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব হে সৌভাগ্যশালী যাত্রিগণ! আপনারা সেই ভগ-বানের শ্রীচরণচিহ্নস্পর্শ করিয়া আজ কৃতকৃতার্থ হউন। অনন্তর যাত্রিগণ! শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমতি রাধিকার যুগলমূর্ত্তি তথা চরণগঙ্গা দর্শন করতঃ কোটবন ও সূর্য্যকুণ্ড হইয়া শেষশায়ী' যাইবেন। এবং এখানে যে একটি বিস্তীর্ণ ক্ষীর-সাগর আছে তাহারই সন্নিকটে যাত্রিগণ আপন আপন বাসা লইবেন। এই ক্ষীরসাগরের জল লবণাক্ত বলিয়া কেহ পান করেন না। এখানে প্রথমতঃ ক্ষীরসাগরে সংকল্প পূর্ব্বক

স্নান করিতে হয়, পরে শ্রীভগবানের অনন্তশয্যা দর্শন করিয়া যাত্রিগণ! অতি সতর্কতার সহিত এই ভয়াবহ জঙ্গলময় স্থানে একরাত্রি অবস্থিতি করিবেন। নন্দগ্রাম হইতে ক্ষীরসাগর দশক্রোশ ব্যবধান।

যাত্রিগণ! পরদিবস ক্ষীরসাগর হইতে 'শেরগড় বা খেলনবন' উদ্দেশে যাত্রা করিবেন। শেরগড় যাইবার সময় পথিমধ্যে কৃষ্ণকুণ্ড তথা শ্রীবিহারীজী, লালবাগ এবং যমুনাজী দর্শন করিবেন। তৎপরে শেরগড় বা খেলনবনে পৌঁছিয়া শ্রীমদনমোহন, গোপীনাথ, রাধাবল্লভ এবং শ্রীবলদেবজী দর্শনান্তে যাত্রিগণ! বলদেবকুণ্ডের উপর আপান আপন বাসা মনোনীত করিয়া একরাত্রি অবস্থিতি করিবেন। এবং শেষোক্ত শ্রীবলদেবজীর ভোগার্থে প্রত্যেক যাত্রী মাখন ও মিসরী দিবেন। ক্ষীরসাগর হইতে সেরগড় বা খেলনবনের বলদেবকুণ্ডু নয় ক্রোশ ব্যবধান।

উল্লিখিত বলদেবকুণ্ড হইতে বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী যাত্রিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। হিন্দুস্থানী যাত্রিগণ চোবেপাণ্ডাদিগের সহিত 'বস্ত্রহরণ বা চীরঘাট' দর্শন করিয়া 'মাঠগ্রাম' গমন করেন এবং বাঙ্গালী যাত্রিগণ প্রথম 'রামঘাট' যাইয়া শ্রীবলরামজী দর্শন করেন। বলদেবকুণ্ড হইতে রামঘাট দুইক্রোশ ব্যবধান। শ্রীবলরামজী লাঙ্গলের দ্বারা যমুনার স্রোতের গতি বিপরীত দিকে করিয়া দেওয়ায় তদবধি যমুনা এই স্থানে ত্রিধারাতে প্রবাহিত হইতেছেন। রামঘাটের পূর্ব্বদিকে ভগবানের রাসস্থলী 'ভুকনবন' আছে। অনন্তর যাত্রিগণ! নিবারণবন ও নিবারণকুণ্ড এবং বিহারবন হইয়া

তপোবন যাইবেন। এখানে তপোঘাট ও শ্রীসীতারামজীর দর্শন করিতে হয়। এখান হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলে 'অক্ষয়বট' পাইবেন। অক্ষয়বটে আসিয়া অক্ষয়বিহারী দর্শন করতঃ বরাবর বস্ত্রহরণ বা চৌরঘাট যাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী গোপবালিকাগণ প্রত্যহ প্রত্যুষে এই ঘাটের উপর বস্ত্রাদি রাখিয়া উলঙ্গবেশে স্নান করতঃ কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিতেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগের বস্ত্রাদি হরণ করিয়া কেলীকদম্ব বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলে গোপ-বালিকাগণ তাহাদের কাত্যায়নী-পূজা সফলমনোরথ বিবে-চনায় সকলেই হৃষ্টচিত্তে হস্তযুগলদ্বারা আপন আপন লজ্জা নিবারণ পূর্ব্বক্ শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে যাইয়া অতি বিনীত বচনে বস্ত্রাদি চাহিয়া লইয়াছিলেন। এই কারণে ব্রজবাসিগণ এখানে বস্ত্র দান পাইয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবনধামে যে চৌর-ঘাট আছে, উহার প্রকৃত নাম চেনঘাট। তৎপরে যাত্রিগণ কাত্যায়নীদেবী দর্শন করিয়া বরাবর 'নন্দঘাট' যাইবেন। চৌরঘাট হইতে নন্দঘাট তিনক্রোশ ব্যবধান। কথিত আছে, কোন এক দ্বাদশী তিথির শেষ রাত্রে যখন শ্রীনন্দমহারাজ ঐ ঘাটে স্নান করিতেছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণদর্শনাকাঙ্ক্ষী বরুণদেব নিজ দূত দ্বারা নন্দজাকে বরুণালয়ে লইয়া যান। অন্তর্য্যামী ভগবান পিতার উদ্ধার কামনায় তৎক্ষণাৎ উক্ত ঘাটে যাইয়া জলে অবগাহন পূর্ব্বক ;বরুণালয়ে গমন করতঃ বরুণদেবের বাসনা পূর্ণ করিয়া পিতাকে উদ্ধার করেন। এখানে ব্রজবাসিগণ রেশমী শীতবস্ত্র বা শালের জোড়া দান পাইয়া থাকেন। যাত্রিদিগকে এই স্থানে একরাত্রি বাস করিতে

হয় এবং যে সকল যাত্রিদিগের সহিত গোশকট, তাম্বু এবং অধিক আসবাব থাকে, তাঁহারা এই স্থান হইতে উহাদিগকে ভাড়া পরিশোধ করিয়া দিয়া থাকেন এবং বনদর্শনী বাবদ ব্রজবাসী বিদায় ও ব্রজবাসী ভোজন এই উভয় কার্য্য এই স্থানেই সম্পন্ন করিতে হয়। সচরাচর ব্রজবাসিগণ প্রত্যেক যাত্রীর নিকট তিন টাকা হইতে চারি টাকা করিয়া মোটের উপর বিদায় পাইয়া থাকেন।

অনন্তর প্রাতঃকালে কতক যাত্রী নৌকারোহণে ভদ্রক বা ভদ্রবন, মাঠবন, বেলবন এবং মানসরোবর ইত্যাদি তীর্থ স্থান গুলি দর্শন করিয়া তৎপরে পাণিগ্রাম যাইয়া থাকেন এবং কতক যাত্রি যাঁহারা পদব্রজে গমন করেন, তাঁহারা প্রথম ভদ্রবন যাইয়া দ্বাপর যুগের অশ্বথবট দর্শন করেন। ভদ্রবনের প্রভাবে মনুষ্যগণের নাকপৃষ্ঠলোক প্রাপ্তি হয়। যাত্রিগণ! ভদ্রবন হইতে সঙ্গমকুণ্ড দর্শন করিয়া বিজলীগ্রাম ও মেকবন হইয়া 'ভাণ্ডীরবট্ বা ভাণ্ডীরবন' যাইবেন। ভাণ্ডীর-বন যোগীদিগের প্রিয় স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই বন দর্শনে মনুষ্যগণের পুনর্জ্জন্ম হয় না। এখানে শ্রীদামকুণ্ড ও শ্রীদামজীর দর্শন করিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ইঁহারা উভয়ে এই স্থানে সখাদিগের সহিত মল্লযুদ্ধ খেলা খেলিতেন এবং মহাপরাক্রমশালী শ্রীবলরামজী এই সুপ্রসিদ্ধ বন মধ্যে প্রলম্বাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। ভাণ্ডীর-বনে ভাণ্ডীরকূপের সন্নিকটে যে বিহারীজীর প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহা দর্শন করিয়া যাত্রিগণ! ক্রমশঃ রাধামোহনজী, গোপালজী এবং মহাদেব ইত্যাদির মন্দির হইয়া 'মাঠবন' যাইবেন।

এই মাঠবন বৃন্দাবন হইতে দুই ক্রোশ ব্যবধান। প্রবাদ আছে দধি দুগ্ধাদি রাখিবার জন্য 'মাঠ' নামক মৃত্তিকা পাত্র এখান হইতে সকলে লইয়া যাইত বলিয়া তদনুযায়ী মাঠবন নাম হইয়াছে। মাঠবনে দর্শনোপযুক্ত কোন মন্দির বা স্থান নাই এই হেতু যাত্রিগণ এখান হইতে বরাবর 'বিল্ববন' যাইয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিয়া থাকেন। বিল্ববন তীর্থে আসিয়া যিনি কৃষ্ণকুণ্ডে স্নান করতঃ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বপাপোম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হন। কথিত আছে—শ্রীকৃষ্ণের রাস দর্শন উপলক্ষে যখন শ্রীমতি-লক্ষ্মীদেবী শ্রীবৃন্দাবনধামে শুভাগমন করেন তথন শ্রীকৃষ্ণ এই আদেশ দেন যে, হে লক্ষ্মি! তুমি এখনও শ্রীবৃন্দাবনধামের উপযুক্ত পাত্রী হও নাই, কিছুকাল নিয়মিতরূপে তপ জপ কর। শ্রীমতি লক্ষ্মীদেবী এই মধুর ও যুক্তিপূর্ণ উপদেশ পাইবা মাত্র অত্র স্থানে আসিয়া শ্রীবৃন্দাবনের দিকে যোড়হাত করতঃ তপ করিতে লাগিলেন। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার দিবস এখানে বনভোজন উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। তদনন্তর যাত্রিগণ! যে স্থানে শ্রীমতি রাধিকা মানভরে বর্ষাকালের বারিধার ন্যায় নয়নাশ্রু ফেলিয়াছিলেন, সেই মানসরোবরে যাইয়া শ্রীমতি রাধিকার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিবেন এবং তৎপরে পাণিগ্রাম যাইয়া ছয় ক্রোশ রাস্তা পরিভ্রমণের ক্লেশ এই স্থানেই রাত্রিবাসে দূর করিবেন।

যাত্রিগণ! পরদিবস প্রাতে পাণিগ্রাম হইতে যাত্রা করিয়া 'লোহবন' যাইবেন। লোহবনে শ্রীভগবান্ লোহজঙ্ঘাসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার অপর নাম লোহজঙ্ঘ-

বন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। লোহজঙ্ঘবন দর্শনে মনুষ্য-গণের সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয়। ব্রজবাসিগণ এখানে লোহা দান পাইয়া থাকেন। তৎপরে যাত্রিগণ। শ্রীগোপীনাথজী দর্শন করিবেন। ইহার পর কৃষ্ণকুণ্ড দর্শন করতঃ বন্দিগ্রামে যাইয়া ভগবতীরূপিনী বন্দি তথা আনন্দী এই দুই ভগ্নীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। ইঁহারা শ্রীমতি যশোদা মাতার নিকট দাসী-বৃত্তি করিতেন। গোশালা পরিষ্কার করা এবং ঘুঁটে দেওয়া এই দুই কাজ ভিন্ন ইঁহাদের অন্য কোন কাজ ছিল না। প্রবাদ আছে,যে সকল বালকেরা উপযুক্ত সময়ে কথা কহিতে পারে না,সেই সকল বালকেরা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র কথা কহিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগের পিতা মাতারা ইঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এখান হইতে বলভদ্র বা ক্ষীরসাগর-কুণ্ড যাইয়া (বজ্রনাভের প্রস্তুত) বলদেবজী দর্শন করিবেন। ইহাঁর দ্বিতীয় নাম 'মস্ত বলাই'। জনশ্রুতি যখন দুরাত্মা যবন-গণ এই বলদেবজীর উপর অত্যাচার করিতে আইসে, তখন উহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক অকস্মাৎ কেহ অন্ধ কেহ বা কাণা হইয়া যাওয়ায় সকলেই ভীতান্তঃকরণে স্বস্থানে পলায়ন করে। এই স্থানে সকল সময়েই অধিক যাত্রীর সমাগম হয় বলিয়া দুই চারিটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। পাণিগ্রাম হইতে ক্ষীরসাগরকুণ্ড সাত ক্রোশ ব্যবধান।

অধিকাংশ যাত্রী উপরোক্ত ক্ষীরসাগরকুণ্ড দর্শন করিয়া বরাবর মহাবন যাইয়া রাত্রি বাস করেন এবং যাঁহারা পথক্লান্ত হইয়া পড়েন, তাঁহারা একরাত্রি ক্ষীরসাগরকুণ্ডেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

যাহা হউক যাত্রিগণ! পরদিবসে অতি প্রত্যুষে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান 'মহাবন' উদ্দেশে যাত্রা করিবেন। যে সকল যাত্রী ইহার পূর্ব্ব দিবস পাণিগ্রাম হইতে বরাবর বলদেবজী হইয়া মহাবন গ্রামে আসিয়া একরাত্রি বাস করেন, তাঁহারা অদ্য বলদেবজী হইতে যে সকল যাত্রী মহাবন আইসেন, তাহাদিগের সহিত একত্রে সম্মিলিত হইয়া মহাবনের দর্শনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। ক্ষীরসাগরকুণ্ড হইতে মহাবন তিন ক্রোশ ব্যবধান। শ্রীভগবানের একান্ত প্রিয়তম স্থান মহাবন দর্শনে মনুষ্যগণ ইন্দ্রলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। মহাবন যাইবার সময় পথিমধ্যে শ্রীচিন্তাহরণ-মহাদেবজীর দর্শন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডঘাটে যাইবেন এবং তথায় সঙ্কল্পান্তে স্নান করিবেন। কথিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ বাল্যাবস্থায় এই স্থানে সখাদিগের সহিত খেলা করিবার সময় বাল্যস্বভাব বশতঃ যখন মাটি খাইয়াছিলেন,তখন গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যশোদামাতার নিকট এই অভিযোগ করেন যে,আপনার পুত্র'শ্রীকৃষ্ণ' আজ খেলা করিবার সময় মাটি খাইয়াছে। যশোদামাতা গোপবালকদিগের কথামত তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ডাকাইয়া তিরস্কার সূচক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ওরে কৃষ্ণ! তুই কি আজ খেলা করিতে করিতে মাটি খাইয়াছিস্?' উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদন করিয়া যশোদামাতাকে বলিলেন,—'এই আমার মুখ দেখ মা, কৈ আমিত মাটি খাই নাই।' এই প্রকারে যখন শ্রীকৃষ্ণ মুখব্যাদন করিয়া যশোদামাতাকে মুখ দেখাইলেন, তখন যশোদামাতা মাটির পরিবর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন এবং

শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া অনবরতঃ মুখ চুম্বন করতঃ আদর করিতে লাগিলেন। তদনন্তর যাত্রিগণ! যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ মাটি খাইয়াছিলেন, সেই স্থানে যে মৃত্তিকা-বিহারীর মূর্ত্তি আছে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া ক্রমশঃ পূতনাখাল, শ্রীকৃষ্ণের ষষ্ঠিঘর ও বসুদেবজী দর্শন করিবেন। এতদ্দেশীয় লোকেরা ষষ্ঠিঘরকে ছঠিপাল্‌না বলিয়া থাকেন। তৎপরে চৌরাশী-থামযুক্ত নন্দভবনে যাইয়া শ্রীনন্দযশোদা, উদূখল বা উখল, ও যমলার্জ্জুন দর্শন করিয়া রমণরেতিতে যাইবেন, তথায় শ্রীরমণবিহারী ঠাকুরকে দর্শন করতঃ এই স্থান হইতেই 'কোলগ্রাম' দর্শন করিবেন। তদনন্তর 'গোপকূপ' হইয়া বল্লভাচার্য্য গোস্বামিদিগের আবিষ্কৃত 'গোকুল' যাইতে হয়। গোকুলে গোকুলনাথজী, নন্দ-যশোদা, মদনমোহন, দ্বারিকা-নাথ, গোকুলেশ্বর এবং বিঠ্‌ঠলনাথজীর মন্দির দর্শন করিবেন। পরিশেষে যাত্রিগণ যখন মথুরাধামে আইসেন তখন কতক যাত্রী পাকা রাস্তা হইয়া এবং কতক যাত্রী গোকুলের সন্নিকট শ্রীযমুনাজীর উপর যে নৌকার পুল আছে তাহা পার হইয়া মথুরায় আইসেন। গোকুল ছাড়িয়া মথুরাভিমুখে আসিবার সময় যাত্রিগণ কেহ বা পুলের উপর হইতে এবং কেহ বা পাকা রাস্তা হইতেই দূরস্থিত শ্রীমতি রাধারাণীর জন্ম স্থান 'রাবল-গ্রাম' দর্শন করিয়া থাকেন। পাকা রাস্তা হইতে রাবলগ্রাম অতি সন্নিকট বলিয়া কোন কোন যাত্রী রাবলগ্রামে যাইয়াও দর্শনাদি করেন। রাবলগ্রামের লাড়লীজীর মন্দির গুজরাট নিবাসী কুশলশেঠ্‌ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে,—স্বেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির সর্ব্ব

প্রথমেই আপনার শরীর দ্বিবিধরূপে অর্থাৎ বামার্দ্ধভাগ স্ত্রীরূপা ও দক্ষিণার্দ্ধভাগ পুরুষরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্তই শ্রীমতি রাধা শ্রীকৃষ্ণ-দেহের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ বাম অংশ পূর্ণতমা মহাশক্তি বলিয়া অনুমিত হয়। অপর পক্ষে কোন কোন মহাত্মার মতে কৃষ্ণোপাসক বৃষভানুরাজার পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী ভার্য্যা শ্রীমতি কীর্ত্তিদার গর্ভে ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টমী তিথির মধ্যাহ্নকালে কৃষ্ণবল্লভা শ্রীমতি রাধা অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। প্রতি বৎসর উক্ত তিথিতে লাড়লীজীর মন্দিরে মহাসমারোহে উৎসব হইয়া থাকে। গোকুলের তৃণাবর্ত্তের মেলা প্রশংসনীয়। মহাবন হইতে গোকুল এক ক্রোশ ব্যবধান হইলেও এই উভয় স্থান একই বলিয়া বিবেচিত হয়।

অনন্তর যাত্রিগণ! মথুরাধামে আসিয়া প্রথমতঃ বিশ্রাম ঘাটে সঙ্কল্লান্তে স্নান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে এই স্থানে সংহার করিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া তদনুযায়ী এই ঘাটের নাম 'বিশ্রামঘাট' হইয়াছে। বিশ্রামঘাটে স্নান করিলে মানবগণের সর্ব্বপাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায়। তৎপরে সতী ব্রুজ (১৫৭০ সালে নির্ম্মিত) ধ্রুবজী, রঙ্গেশ্বর, মহাদেব, কংস-টীলা, পোতরাকুণ্ড (যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মল মূত্রাদির বস্ত্র ধৌত করা হইত) কারাগারে কেশব ভগবান্, দীর্ঘ বিষ্ণু, গোবর্দ্ধননাথজী, রাধাগোবিন্দজী, মদনমোহন, গোপীনাথ, বিহারিজী, ভৈরবনাথজী, গতাশ্রম বা কুজানাথজী, স্বর্গীয় পারীখজী শেঠের প্রতিষ্ঠিত দ্বারিকাধীশ বা মথুরানাথজী, বলদেবজী, বিজয়গোবিন্দ এবং রাধাকৃষ্ণের মন্দিরাদি দর্শন

করিবেন। কথিত আছে—মথুরাধামের ধ্রুবঘাটে যিনি পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করেন, তাঁহার গয়ায় পিণ্ড দান অপেক্ষা ছয় গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। গোকুল হইতে মথুরা তিন ক্রোশ ব্যবধান এবং বিংশতি যোজন বিস্তীর্ণ। সন ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন মথুরাপুরী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হয় তখন অকস্মাৎ এরূপ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প উপস্থিত হয় যে, হিন্দুকারিগরদিগের নির্ম্মিত যাবতীয় অট্টালিকাদি এক-কালীন ভূমিস্মাৎ হইয়া ধুলিরাশিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রবলবাত্যা দ্বারা যেরূপ মেঘরাশী দূরীভূত হয়, তদ্রূপ যিনি একবার মাত্র মথুরাধাম পরিদর্শন করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সকল পাপ বিনষ্ট হয়। এমন কি যদ্যপি কোন ব্যক্তি দর্শনেচ্ছু হইয়াও তাহার ভাগ্যে মথুরা দর্শন না ঘটে, তত্রাপি তাহার দেহান্তে মথুরাপুরীতেই জন্ম লাভ হইয়া থাকে। রামায়ণে উক্ত হইয়াছে যে—লোনারের জ্যেষ্ঠপুত্র মধুদৈত্য ভোলানাথ আশুতোষকে প্রসন্ন করিয়া এক জাঠা বা শূল প্রাপ্ত হয় এবং ঐ শূল উহার পুত্র লবণকে সমর্পণ করিয়া বরুণালয়ে চলিয়া যাইলে কিছু দিবস পরে তপোবনবাসী ঋষিগণ লবণের দৌরাত্ম্যে যখন মহা অস্থির হইয়া পড়েন, তখন সকলে একত্রিত ও একমত হইয়া দয়ার সাগর শ্রীরাম-চন্দ্র রাজার নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে—হে প্রভো! দুর্দ্দান্ত রাবণ অপেক্ষা উপস্থিত লবণের দৌরাত্ম্য আমাদিগের দ্বিগুণতর অসহনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে এবং অচিরে ইহার বিহিত উপায় না হইলে ভজনের বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভব'। এতদ্বার্ত্তা আন্ধাতা রাজার কর্ণগোচর হইলে সর্ব্ব প্রথম তিনি লবণকে

ধ্বংস করিবার জন্য যুদ্ধে যাইয়া হত হন এবং তৎপশ্চাৎ শত্রুঘ্ন যখন উহার বধার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে ভার্গব মুনির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার উপদেশানুযায়ী লবণ যে শিবালয়ে শূল রাখিয়া ভক্ষ বস্তুর জন্য বনে গমন করিত সেই শিবমন্দির লবণের অনুপস্থিত কালীন বহুসংখ্যক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করিলেন। ইত্যবসরে লবণের সহিত শত্রুঘ্নের সাক্ষাৎ হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হয় কিন্তু তৎকালীন লবণ ত্রিশূলহীন অবস্থায় থাকায় অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই যুদ্ধে হত হন। তদবধি মথুরা সূরসেন নামে খ্যাত হয়। কিন্তু মথুরা, বোধ হয় মাথুর ব্রাহ্মণ অর্থাৎ চোবে-দিগের বাসস্থান বলিয়া মথুরা নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক মথুরার দর্শনাদি কার্য্য সমাপনান্তে বন ভ্রমণ কালীন যাঁহাকে সর্ব্ব প্রথম দর্শন করিয়া পরিক্রমা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধিকারী দেবাদিদেব ভূতেশ্বরমহাদেব তথা পাতালদেবীকে দর্শন করণানন্তর পাণ্ডব-দিগের স্থাপিত মহাবিদ্যা বা মাহেশ্বরী, গোকর্ণেশ্বর মহাদেব এবং চক্রতীর্থের সন্নিকট কৃষ্ণ গঙ্গাতে স্নান করতঃ শ্রীবৃন্দাবন-ধামাভিমুখে অগ্রসর হইবেন। পথিমধ্যে অক্রুরঘাটে গোপী-নাথজীর মন্দির দর্শন করণানন্তর শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে মুনিপত্নী-দিগের নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া খাইয়াছিলেন, সেই ভাৎরোড় স্থান দর্শনান্তে বরাবর শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া শ্রীশ্রীগোপেশ্বর মহাদেবজীকে দর্শন করতঃ আপন আপন কুঞ্জে যাইয়া দীর্ঘকাল বন প্রদক্ষিণের শ্রম দূর করিবেন। ইতি

সমাপ্ত।